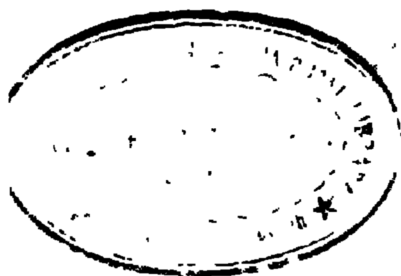
ডাকিনী



শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ—১৩৫২

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বেঙ্গল ইউনাইটেড ট্রেডার্স লিঃ এর মুদ্রণ বিভাগে [ম্যাগনেট প্রেস ৩৫ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা], শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

শ্রীনীহার রঞ্জন রায়

শিল্পরসিকেষু

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
প্রণীত

প্রবন্ধাদি

রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহ
রবীন্দ্র কাব্য-নির্ঝর
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
মাইকেল মধুসূদন
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য
এক কলম

উপন্যাস ও গল্প

দেশের শত্রু
পদ্মা
জোড়া দীঘির চৌধুরী পরিবার
কোপবতী
শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব্ব
গল্পের মতো
ডাকিনী
গালি ও গল্প

কাব্য ও কবিতা

দেয়ালি
বসন্তসেনা
আত্মঘাতিনী
প্রাচীন আসামী হইতে
বিদ্যাসুন্দর
প্রাচীন গীতিকা হইতে
যুক্তবেণী
অকুন্তলা

নাটক

ঋণং কৃত্বা
ঘৃতং পিবেৎ
মৌচাকে ঢিল
পরিহাস বিজল্পিতম্
ডিনামাইট
গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টর

ডাকিনী

চতুর্বর্গের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ না থাকায় হলদেকলসির চৌধুরিগণ কখনো তাহার চর্চা করে নাই এমন কি চতুর্বর্গের সারাংশ মাত্র রাখিয়া বাকিটুকু তাহারা বরাবর বর্জন করিয়া আসিতেছিল। এহেন কালে এবং এহেন ক্ষেত্রে কিভাবে চতুর্বর্গাতীত সরস্বতীর উদয় হইল তাহা বিস্ময়কর হইলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নহে। সংসারে অপ্রত্যাশিতের অবকাশ সর্বদাই রহিয়াছে।

হলদেকলসির বর্তমান জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী পিতৃহীন। বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মাতাই তাহার অভিভাবক। এখনো সে বিবাহ করে নাই। তবে ভাবে গতিকে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, এই অসহায় যুবকটি বিবাহ করিবামাত্র মাতার অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর অঞ্চল অবলম্বন করিবে। কোন কোন পুরুষ চিরকাল স্ত্রীলোকের অঞ্চল ছায়ায় করদরাজ্যরূপে জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। শশাঙ্ক চৌধুরী সেই দলের।

পূজার ছুটিতে শশাঙ্ক ও তাহার মাতা অম্বাময়ী দেওঘরে আসিয়াছেন। দেওঘরে শশাঙ্কর পিতা একটি বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সেই একতলা বাড়ীর উপরে আরো তিনটে তালা চড়াইয়া দিয়া অম্বাময়ী বাড়ীটাকে পাড়ার মধ্যে উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বাড়ীটি তাঁহার পরম গৌরবের বস্তু। তাঁহাদের বহু পুরুষের পাণ্ডাঠাকুর হঠাৎ একদিন কোন কারণে বাড়ীটির একটি খুঁৎ প্রদর্শন করাতে অম্বাময়ীর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। তারপরে অনেক দিন তিনি দেবদর্শন করিতে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন। অম্বাময়ী জানিতেন দেবদর্শনে পাণ্ডার যেমন

লাভ দেবতার তেমন নহে। এত বড় দেওঘর সহরে একটিমাত্র পথ তাঁহার পরিচিত—মন্দির হইতে তাঁহার বাড়ীর পথ। এই দুটি স্থান ছাড়া কদাচিৎ অন্যত্র তিনি যাইতেন। একদিন মন্দির হইতে ফিরিবার পথে বাড়ীর কাছে আসিয়া শশাঙ্ক বলিয়া উঠিল—মা, তোমার বাড়ীটা যেন মন্দিরের চেয়েও উঁচু। দেবমন্দিরের উচ্চতা কল্পনাতে লঙ্ঘন করাও পাপ—কাজেই মাতা পুত্রকে তিরস্কার করিলেন বটে—কিন্তু মনে মনে তেমন দুঃখিত হইলেন না। সেদিন চাহিবামাত্র শশাঙ্ক মাতার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ করিল। বলা বাহুল্য শশাঙ্কর পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই, সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। তাহার মা সগর্বে সকলের কাছে বলিয়া বেড়ান—আমার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন ফেল—যেন ধনীর ছেলের পক্ষে পাশ হওয়ার চেয়ে ফেল হওয়ার গৌরব বেশি।

যদুনাথবাবু সদাগরী অফিসের পেন্সনপ্রাপ্ত কেরাণী। তিনি পূজার ছুটিতে দেওঘরে হাওয়া বদল করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার মেয়ে মল্লিকা। মল্লিকাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। যদুনাথবাবু বিপত্নীক। মেয়েকে দিবার মতো অন্য কিছু তাঁহার নাই বলিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মল্লিকা এম-এ পাশ করিয়াছে। সেদিন পিতা-পুত্রী বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেকটা ঘুরিবার পরে ক্লান্ত হইয়া হলদেকলসি কুটীরের গেটের পাশে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে অন্নময়ী মন্দিরে যাইবার উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিতেছিলেন। একটি অপরিচিত মেয়েকে বাড়ীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি শুধাইলেন—কি দেখ্‌ছ মা? মল্লিকা ঠিক যে কি দেখিতেছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। এরকম ক্ষেত্রে সহজতম উত্তরটাই সে দিল—বাড়ীটা বেশ বাড়ী। আপনার বুঝি?

অম্বামরীর মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। হাঁ, মেয়েটি সমজদার বটে। কই এমন করিয়া কোন অপরিচিত ব্যক্তি অযাচিতভাবে তো তাঁহার 'হলদেকলসি কুটীরের' প্রশংসা করে নাই।

তিনি বলিলেন হাঁ মা আমাদেরই বাড়ী। তা এখানে বসে কেন? এসো না ভিতরে। তারপরে গলা একটু খাটো করিয়া বলিলেন—উনি বুঝি তোমার বাবা?

মল্লিকা বলিল—হাঁ, বাবা।

যদুনাথবাবু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অম্বামরী মল্লিকাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু পথের লোক টানিয়া আনিয়া বিশ্রামের সুযোগ দান তো অম্বামরীর অভিপ্রায় নয়—তিনি ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মল্লিকাকে বাড়ীর অন্ধি সন্ধি সব দেখাইলেন। মল্লিকা কতকটা বা ভদ্রতার খাতিরে কতকটা বা সত্যের খাতিরে বাড়ীটার অনর্গল প্রশংসা করিয়া গেল। অম্বামরীর মন গলিয়া গেল।

বিদায় লইবার সময়ে তিনি মল্লিকার নাম, ধাম পুছিয়া লইলেন এবং পরদিন মধ্যাহ্নে আহার করিবার জন্যে পিতা-পুত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

মল্লিকা অম্বামরীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রত্যহ বিকালে পিতাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে আসে। কয়েকদিন পরে একদিন অম্বামরী মল্লিকাকে বাগান দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া নিজে চিকের আড়ালে থাকিয়া যদুবাবুর কাছে কর্মচারীর মারফৎ মল্লিকার সঙ্গে শশাঙ্কর বিবাহ প্রস্তাব করিলেন।

যদুবাবু ঠিক এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন—আমরা গরীব।

অম্বাময়ীর ইঙ্গিতে কর্মচারী বলিলেন—আমরা তো টাকাকড়ি চাই না—ভালো মেয়ে চাই। ঘর বর যদি আপনার অপছন্দ না হয়।

যদুবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ!

তারপরে শশাঙ্কর সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। এম-এ পাশরূপ কেবল যে একটি খুঁৎ মেয়ের ছিল তাহা প্রকাশ পাইল না—প্রকাশ পাইলে কি হইত নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে।

অগ্রাণ মাসেই শশাঙ্কর সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ দেওঘরে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের কিছুদিন পরেই আরও দূরবর্তী স্থানের হাওয়া বদল করিয়া দেখিবার জন্ম যদুনাথবাবু পরলোকে প্রস্থান করিলেন। মল্লিকা কিছুদিন খুব কান্নাকাটি করিল। কিন্তু যে কাল দুঃখের কালো স্রোত ডাকিয়া আনে সেই কালই হাসির শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনারও বাহন। কালক্রমে তাহার চোখের জল শুকাইল এবং মুখে হাসি দেখা দিল। দেওঘরে কয়েক মাস কাটাইয়া ফাল্গুনের প্রথমে অম্বাময়ী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া হল্‌দেকলসি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২

গুড়নদীর তীরে আম কাঁটাল জাম নারিকেলের গাছের মধ্যে হল্‌দেকলসি গ্রাম। বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামখানির প্রভেদ নাই। এপারে মানুষের বাস, ওপারে বিস্তীর্ণ চাষের ক্ষেত। তার মধ্যে আখের ক্ষেতটাই বেশি নজরে পড়ে। শরৎকালে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রৌঢ় আখের সারি সঙীণ-তোলা ব্যূহবদ্ধ সৈন্তবাহিনীর মতো নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকে। শরৎকালের মধ্যেই এই উদ্ভিজ্জ বাহিনী আততায়ীর কাটারির আঘাতে ভূমিশায়ী হইয়া গাড়ী বোঝাই হইয়া

দূরবর্তী চিনির কলের দিকে প্রস্থান করে। শীতের শেষে এখন আখের ক্ষেত শূন্য। রবিশস্য পক্ক প্রায়। ধান-কাটা মাঠে আগুন ধরাইয়া দিয়া ধানের গোড়া পোড়ানো চলিতেছে। ওপারের নিস্তব্ধতার মধ্যে নানা রকম শব্দের পরিণতি লাভের প্রয়াস; এপারে শত রকমের শব্দে তরুরাজি আচ্ছাদিত মানুষের বসতির লক্ষণ। মাঝখানে গুড়নদী দুই দিকের শৈবালের পাড় দেওয়া গঙ্গাজলী শাড়িখানি পরিয়া শীর্ণ স্রোতে চলমানা। সে না মানুষের, না প্রকৃতির।

মল্লিকা সহরের মেয়ে, গ্রামে আসিয়া নিজেকে বড়ই অসহায় অনুভব করিল। এখানকার নিস্তব্ধতা কেমন যেন বুক চাপিয়া ধরে—এখানকার নির্জনতা কেমন যেন অস্বস্তিকর। সহরের মেয়ে গ্রামের মধ্যে কোথাও অবলম্বন পায় না। নূতন আত্মীয়স্বজন এখনও তাহাকে প্রসারিত মনে গ্রহণ করে নাই—নূতন বধূর প্রতি সব শ্বশুরকুলেই প্রথমে একটা প্রতিকূলতার ভাব থাকে। মল্লিকার প্রতি প্রতিকূলতা কিছু বেশি ছিল। অম্বাময়ী কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, কাহাকেও ভাল করিয়া না জানাইয়া তাহাকে ঘরে আনিয়াছেন। সে দোষ যেন মল্লিকারই—মল্লিকার উপরে সকলের রাগটা কিছু বেশি। কারণ, অম্বাময়ীর উপরে রাগ করা চলে, কিন্তু রাগ প্রকাশ করা চলে না। মল্লিকা একা বসিয়া থাকিলেও দোষ—দেখো সহরের মেয়ের অহঙ্কার। আবার সকলের সঙ্গে মিশিতে গেলেও দোষ—দেখো সহরের মেয়ের নির্লজ্জতা। মল্লিকার সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ ক্রমেই যখন সঙ্কটের মুখে—তখন তাহার এক জ্ঞাতি ননদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—মল্লিকা ইংরাজি পড়িতেছে। সে তখনি দৌড়াইয়া গিয়া প্রচার করিয়া দিল—বৌদি ইংরাজি পড়ে। দেখিতে দেখিতে কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—চৌধুরীদের নূতন বউ ইংরাজি পড়ে। সংবাদটা নানা মুখ ঘুরিয়া অবশেষে শশাঙ্কর কানে

আসিয়া পৌছিল। সে রাত্রিবেলা মল্লিকাকে পুছিল—মল্লি, তুমি নাকি ইংরাজি পড়ো ?

মল্লিকা বলিল—হাঁ।

কিন্তু মল্লিকা যেমন আশঙ্কা করিয়াছিল শশাঙ্ক রাগ করিল না—বরঞ্চ যেন খুশি হইল।

শশাঙ্ক বলিল—কি বই ? ফার্ষ্ট বুক ? আমিও ওই বই দিয়ে পড়া সুরু করেছিলাম। তুমি কি বই পড়ছিলে ?

মল্লিকার বইয়ের নাম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু স্বামীর পীড়াপীড়িতে বইখানা বাহির করিতে হইল। শশাঙ্ক দেখিল—ফার্ষ্ট বুক নয় ছোট ছোট অক্ষরে ঠাসা পাতা—বেশ মোটা বই—ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড। শশাঙ্ক গিন্নীর ইংরাজি জ্ঞানে চমৎকৃত হইয়া গেল—এবং পরদিনই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়া নিজে পত্নীর লেখাপড়া প্রচার করিবার ভার লইল। ইহার ফলে মল্লিকার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। একে তো চৌধুরী বাড়ীর বউয়ের পক্ষে ইংরাজি পড়া প্রথাবিরুদ্ধ- তার উপরে তাহার স্বামী এই কাজের সহায়। শশাঙ্ক যদি মল্লিকাকে তিরস্কার করিত—তবে সকলে খুসি হইত—কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত ঘটিল।

শশাঙ্ক সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মল্লিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছে। শশাঙ্ক তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিল—কান্নার কারণ মল্লিকা বলিল না। কি বলিবে, কেন এই কান্না নিজেই ভাল করিয়া জানে না। কোন উত্তর না পাইয়া শশাঙ্ক বলিল—মল্লি তোমার কি এখানে মন টিঁকছে না ?

মল্লিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শশাঙ্ক বলিল—চলো আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। মল্লিকা খুশি হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক বলিল—

এখন বেশ গরম পড়েছে, চলো দার্জ্জিলিং যাওয়া যাক্। এবারে মল্লিকার মুখে হাসি ফুটিল।

পরদিন শশাঙ্ক মাতার কাছে প্রস্তাব করিল যে, সে দার্জিলিং যাইতে চায়। অম্বাময়ী পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন ধনীর ছেলেরা দার্জিলিং-এ যায়; কাজেই তিনি বলিলেন, বেশ তো ষ্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ী আনিয়ে নিয়ে যাওনা বাবা।

শশাঙ্ক বলিল—পাল্কীও লাগবে যে।

বিস্মিত অম্বাময়ী বলিল—পাল্কী লাগবে কেন?

শশাঙ্ক বলিল—মল্লিকাও যাবে।

অম্বাময়ীর মাথায় বিস্ময়ের আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। মল্লিকার ইংরাজি পড়ার কথায় তিনি রাগ করেন নাই—কারণ যে বধূকে তিনি একার দায়িত্বে নির্বাচন করিয়াছেন, সে যে আর পাঁচজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—ইহাতে তাঁহারি গৌরব। কিন্তু চৌধুরী বাড়ীর বধূ স্বামীর সঙ্গে দার্জিলিং যাইবে! অম্বাময়ী নির্বোধ নন। তিনি বুঝিলেন হাসিমুখে অনুমতি না দিলে শুকমুখে পুত্র ও পুত্রবধূর দার্জিলিং যাত্রার অসম্মত সাক্ষ্য বহন করিয়া তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইবে। কাজেই তিনি বলিলেন—বেশ তো বউমাও ঘুরে আসুক না কেন। অম্বাময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বুঝিতে পারিলেন—এতদিনে মাতার অঞ্চল হইতে বধূর অঞ্চলে শশাঙ্কর সংক্রান্তি ঘটিয়াছে। তিনি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া মুখ বুজিয়া রহিলেন। পুত্রস্নেহচোর বধূর প্রতি তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন।

দার্জ্জিলিং-এর স্নিগ্ধ শুশ্রূষার মধ্যে আসিয়া মল্লিকার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল। সংসারের সব গ্লানির উপরে সুধার প্রলেপ দিবার জন্তেই তো দিকে দিকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের সুধার তুলি উদ্যত করিয়া গিরিরাজ এত আড়ম্বর করিয়াছেন। কুয়াশায় সিক্ত অঞ্চলখানা সেই জন্তেই মানুষের মনের

উপর দিয়া তিনি এতবার করিয়া বুলাইয়া দেন—মুছিয়া যাক সব তাপ, ঘুচিয়া যাক্ সব দাহ। এখানেও যে সান্ত্বনা না পায়—সে সত্যই দুর্ভাগা। মল্লিকা আর শশাঙ্ক সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। ধাপে ধাপে পাহাড় নামিয়া গিয়াছে, যাহার নিম্নতম প্রান্তে প্রবল স্রোতস্বিনী—গর্জনের দ্বারা মাত্র অনুমানগম্য। থাকে থাকে বলিষ্ঠ বৃক্ষরাজি উঠিতে উঠিতে আকাশকে প্রায় ছুঁইয়া দিয়াছে আর কি—যেখানে পরীদের খেলার ঘুড়ির মতো পাণ্ডু চাঁদখানা ঝুলিয়া আছে! সর্পিল পথ, গভীর উপত্যকা, উচ্চ শৃঙ্গ—এসব কি কল্পনায় পাইবার? এমন ঘন শ্যামলতা আর এমন ফুলের বৈচিত্র্য! আর এই স্বর্গীয় রঙ্গমঞ্চে আলো-ছায়ার অর্ধ-নারীশ্বরের যে অন্তহীন অভিনয় চলিতেছে, কুয়াশার মলমল তাহার উপরে অঙ্কে অঙ্কে যবনিকা টানিয়া দেয়। মল্লিকা ভাবে এই রহস্য, এই সৌন্দর্য, এ কি এই জগতেরই অন্তর্গত, না তাহারা এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে—যেখান হইতে আভাসে অন্য এক জগতের এই সব ছবি দৃশ্যমান? মল্লিকা মুগ্ধ হইয়া গেল। শশাঙ্ক খুশি হইল। দুইমাস কাটাইয়া তাহারা আবার দেশে ফিরিয়া আসিল।

৩

শশাঙ্ক ও মল্লিকা ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই সকলের চোখে যে পরিবর্তনটা ধরা পড়িল—শশাঙ্কর শরীর খারাপ। সে কৃশ ও কেমন যেন রক্তশূন্য! তবে নাকি দার্জিলিঙে গেলে শরীর ভালো হয়! যাহারা কখনো দার্জিলিঙে যায় নাই—আর যাইবারও যাহাদের বিন্দু-মাত্র সম্ভাবনা নাই—তাহারা শশাঙ্কর দৃষ্টান্তে দার্জিলিং না যাইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল। অথচ ইহার ঠিক বিপরীত প্রমাণ মল্লিকা

গালে ও দেহে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিল না।

অম্বাময়ী কাতর হইয়া বলিলেন—এ কি বাবা, তোর শরীর এত খারাপ হ'ল কেন ?

শশাঙ্ক বলিল—ওখানে পাহাড়ে ওঠানামা করতে গেলে শরীর একটু খারাপ হয়। ও কিছু নয়।

অম্বাময়ী বলিলেন—সে আবার কি কথা! দেওঘরের বাড়িতে চারতলা থেকে একতলায় দিনের মধ্যে কতবার ওঠানামা করেছিস, কই তোর শরীর তো খারাপ হয়নি!

যাই হোক অম্বাময়ী চিন্তিত হইয়া পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাহার শরীরের বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। ওই সঙ্গে মল্লিকার শরীরটাও যদি সমান খারাপ হইত তবে হয়তো এ পরিবর্তন তেমন করিয়া কাহারো চোখে পড়িত না—কিম্বা পড়িলেও কেহ কিছু মনে করিত না। এখন শশাঙ্কর পরিজন বিশেষ করিয়া তাহার মাতা বধূর উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন। পৃথিবীর মধ্যে এক বাংলাদেশেই বোধ করি শরীর ভালো হওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ।

পূজার পরে অম্বাময়ী স্থির করিলেন এবারে দেওঘরে না গিয়া কাশী যাইবেন। তিনি শশাঙ্ককে বলিলেন—বাবা এবার আমাকে কাশী নিয়ে চল্।

শশাঙ্ক কি যেন বলিতে যাইতেছিল, অম্বাময়ী বলিলেন—না, না, বিদেশে বৌটাকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাইনে। সে থাকুক। আর আমরা তো বেশি দিন ওখানে থাক্‌বো না।

আসলে বৌমার কষ্টটা নিতান্তই অবান্তর। বধূ যে পুত্রকে টানিয়া লইয়া দার্জিলিং গিয়াছিল—ইহা তাহারই উত্তর। অম্বাময়ী দেখাইয়া

দিতে চান—পুত্রের উপরে এখনো তাঁহার পূর্ববৎ অধিকার আছে। বধূ যদি তাহাকে মার কাছ হইতে টানিয়া লইয়া দার্জিলিং যাইতে পারে—তবে মাতাও তাহাকে বধূর কাছে হইতে টানিয়া কাশী লইয়া যাইতে সক্ষম। শশাঙ্ক তাঁহার সঙ্গে যাইবে, মল্লিকা যাইবে না, এই চিন্তাতেই তিনি উৎফুল্ল বোধ করিলেন—এমন কি পুত্রবধূর সঙ্গে অনেক দিন পরে এক আধটা কথাও বলিয়া ফেলিলেন।

অম্বামরী ও শশাঙ্ক কাশী পৌঁছিলে পরিচিত আত্মীয়স্বজন দেখা করিতে আসিল। তাহারা আসিয়া সকলেই একবাক্যে জানাইল অম্বামরীর শরীর বিশেষ খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, কথাটা সত্য নয়, দ্বিতীয়তঃ, ওটা একটা অভ্যর্থনার অর্থহীন প্রথামাত্র। উভয় পক্ষেই জানে কথা অমূলক তবু বলিতে হয়—ওটা ভদ্রতা। কিন্তু সত্যটাও তাহাদের চোখ এড়াইল না। শশাঙ্কর শরীর যে অতিশয় কৃশ হইয়া পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সকলেই উদ্বেগ অনুভব করিল।

এই সব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একজন নিস্তারিণী দেবী। ইনি শশাঙ্কর দূরসম্পর্কিত পিসি। এক সময়ে নিস্তারিণী দেবী শশাঙ্কদের সংসারেই থাকিতেন—এখন তাহাদেরই প্রদত্ত মাসোহারায় কাশী বাস করেন। তিনি শশাঙ্কর কৃশতা দেখিয়া একপ্রকার ডুকরিয়া উঠিলেন—ও বৌদি এ কি সর্বনাশ তুমি করেছ! সোনার চাঁদ যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

নিস্তারিণীর প্রতিকূল সমালোচকগণ বলিতে পারেন যে, তাঁহার স্বরের উচ্চতার উপরে মাসোহারার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—কিন্তু তাহা ছাড়া কিছু আন্তরিকতা থাকাও অসম্ভব নয়।

নিস্তারিণী পুছিলেন—কবে থেকে এমন হ'ল? অম্বামরী বলিলেন, বিয়ের পর থেকেই তো চোখে পড়ছে।

বলা বাহুল্য কথাটা মিথ্যা। কিন্তু যে পুত্রবধূর উপরে তিনি রুষ্ট

তাহার উপরে স্বভাবতঃই দোষটা চাপাইয়া দিলেন। নিস্তারিণীরও কথাটা মনে লাগিল। কারণ শশাঙ্কর বিবাহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও যাইবার রাহা খরচ পান নাই—সেজন্ত গোড়া হইতেই তিনি বধূকে দোষী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই এখন অম্বাময়ীর কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে হইল শশাঙ্কর যে শরীর খারাপ তাহার জন্ত মল্লিকাই দায়ী।

অম্বাময়ী বলিলেন, সেইজন্তেই তো শশাঙ্ককে নিয়ে পশ্চিমে এসেছি, দেখি যদি তাহার শরীরটা সারে। নিস্তারিণী সেদিন আর কোন কথা বলিলেন না—সেদিনের মতো উঠিয়া পড়িলেন।

দু'চার দিন পরে আবার নিস্তারিণী আসিলেন। বিশ্বনাথের মহিমা, ব্যাসকাশীর ইতিহাস, বাজার দর প্রভৃতি যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক আলোচ্য বিষয় আছে তাহার সমালোচনা অন্তে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন হাঁ বৌদি, এ কয়দিন আমি শশাঙ্কর কথা ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তে পারিনি। সোনার চাঁদের শরীর যে এমন কাহিল হ'য়ে গেল এর তো একটা বিহিত করতে হবে।

অম্বাময়ী বলিলেন—সেইজন্তেই তো, বোন পশ্চিমে আসা!

নিস্তারিণী বলিলেন—পশ্চিমে এসেছ ভালই করেছ। কিন্তু এত জায়গা থাক্‌তে বাবা বিশ্বনাথ নিজ ক্ষেত্রে টেনে আনলেন কেন? এ বাবার দয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বাবার দয়াতে অম্বাময়ীর কিছুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু ঠিক কি আকারে সে দয়া প্রকাশিত হইবে না বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসুভাবে তিনি নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন নিস্তারিণী গলা খাটো করিয়া সুরু করিলেন, চৌষট্টিঘাটের কাছে এক ব্রহ্মচারী মাতা থাকেন—একেবারে ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালদর্শী। কত লোক যে তাঁহার প্রসাদে বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছে তার

সীমা সংখ্যা নাই—এই বলিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। এবং অবশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—একবার তাঁহার কাছে গেলে হয় না—কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র ও পশ্চিমের জল হাওয়া স্বাস্থ্যদায়ক বটে, কিন্তু বাবার দয়া ও ব্রহ্মচারী মাতার শক্তির কাছে কিছুই কিছু নয়।

অম্বাময়ীর এরূপ আধিদৈবিক চিকিৎসায় আপত্তি হইবার কথা নয়, বিশেষ পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া তিনি অবিলম্বে রাজি হইলেন। স্থির হইল পরদিন উভয়ে ব্রহ্মচারী মাতার কাছে যাইবেন।

চৌষট্টিঘাটের কাছে এক ভাঙা দোতালা বাড়ীতে ব্রহ্মচারী মাতা থাকেন। পরদিন অম্বাময়ী ও নিস্তারিণী যখন তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও আসন ছাড়িয়া ওঠেন নাই। দুজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন—অম্বাময়ী পায়ের কাছে মোটা প্রণামীর টাকা রাখিলেন। অম্বাময়ী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলেন—হাঁ প্রকৃতই ব্রহ্মচারিণী বটেন—মাথার জটা হইতে পা পর্যন্ত আধিদৈবিক ক্ষমতায় দেদীপ্যমান। মাতার যেমন বিরাট চেহারা, তেমনি বিশাল মুখমণ্ডলে ভাঁটার মতো দুটি চোখ, মাথার জটা পিঠ ঢাকিয়া মাটিতে লুণ্ঠিত, গলায় থাকে থাকে ছোট বড় রুদ্রাক্ষের একরাশ মালা, কপালে সিঁদুরের ছাপ, পরিধানে গেরুয়া, পাশে রক্ষিত রক্তবর্ণ ত্রিশূল—সম্মুখে রক্তজবার এবং রক্তচন্দনের পূজার উপকরণ—পাশে নরকপালে কারণবারি।

তিনি বলিলেন—শুভমস্তু।

হাঁ—দেহের অনুরূপ কণ্ঠস্বর। মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিলে তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া মুহূর্তে বিনাশ করিবার মতো তাঁহার প্রবল প্রচণ্ডতা।

অম্বাময়ী চুপ করিয়া থাকিলেন আর নিস্তারিণী তাঁহাদের আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া গেলেন। সব শুনিয়া ব্রহ্মচারী মাতা

তাহাদিগকে আগামী শনিবারে পুনরায় আসিতে বলিলেন—ইতিমধ্যে তিনি সমস্ত সমস্যার নাকি মীমাংসা করিয়া রাখিবেন।

শনিবারের পরে মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের পরে অমাবস্যা—এমনি করিয়া বিশেষ বিশেষ তিথিতে ও বারে দুইজনে ব্রহ্মচারী মাতার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারেই অন্নাময়ী মাতাকে মোটা প্রণামী দিতে লাগিলেন। অবশেষে মাতা তপস্যার্জিত বুদ্ধিবলে বুঝিলেন—অতঃপর নীরব হইয়া থাকিলে ভক্তের সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা—কাজেই একদিন শনিবার অমাবস্যা তিথিতে তিনি অন্নাময়ীর সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ব্রহ্মচারী মাতা অন্নাময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বাছা, তোমার পুত্রবধূর ডাকিনীর অংশে জন্ম। ডাকিনীর অংশে যে-সব স্ত্রীলোকের জন্ম তাহারা স্বামীহন্ত্রী হয়। তাহাদের প্রভাবে স্বামীরা ধীরে ধীরে শুকাইয়া মারা যায়। স্বামী যতই শুকাইয়া আসিতে থাকে ডাকিনী ততই স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী হইয়া ওঠে।

অন্নাময়ী মনে মনে লক্ষণ মিলাইয়া লইতে লাগিলেন—সবই তো সত্য বটে। শশাঙ্ক কৃশ হইতে কৃশতর হইতেছে—মল্লিকার স্বাস্থ্য ও রূপ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পুত্রের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল।

ডাকিনীর অংশে জন্ম বলিতে কি বুঝায় ব্রহ্মচারী মাতা তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শনি মঙ্গলবারে, অমাবস্যা তিথিতে কামরূপ কামাখ্যা হইতে ডাকিনীর হাড় গভীর রাত্রে আকাশ পথে উড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার গতিপথের নীচে কোন কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে ডাকিনী তাহাকে ভর করে। তাহার মধ্যে ডাকিনীর অংশ আসিয়া বর্তায়। এরূপ কন্যার মাতা প্রায়ই জীবিত থাকে না।

অম্বাময়ী দেখিলেন—কথা ঠিক। মল্লিকার মাতা তাহার জন্মের কিছুদিন পরেই মারা গিয়াছিল। অম্বাময়ী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—মাতাজী, এখন তুমি উপায় করিয়া দাও।

মাতাজী হাসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—বাছা তোমার ভয় নাই। আমার কাছে ডাকিনী যোগিনী সবাই জব্দ—কারণ আমি কামরূপ কামাখ্যায় গিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ডাকিনী সিদ্ধ হইয়াছি। আমি এখন মন্ত্রপূত আধিদৈবিক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিব যাহাতে তোমার পুত্রবধূকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিনীর অংশ পলায়ন করিবে, তোমার পুত্রের পুনরায় স্বাস্থ্যোদ্ধার ঘটিবে। কিন্তু তার জন্তে তোমার পুত্রকে একবার এখানে লইয়া আসা দরকার—কারণ তাহাকে সজ্ঞানে স্বয়ং এই ঔষধ পুত্রবধূর হাতে বাঁধিয়া দিতে হইবে।

অম্বাময়ী এই প্রস্তাবে প্রমাদ গুণিলেন। শশাঙ্ক নিশ্চয় এসব কথা বিশ্বাস করিবে না—আর একটা গণ্ডগোল করিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিবে।

অম্বাময়ী বলিলেন—মাতাজী—আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর- তাহাদের নাস্তিক বলিলেই চলে। তাহারা কি এসব দৈব ব্যাপার বিশ্বাস করিবে ?

মাতাজী নরকপাল হইতে খানিকটা পানীয় গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—বাছা সেজন্ত তুমি ভাবিও না। মহাশক্তির কৃপায় আমি এমন ক্ষমতা লাভ করিয়াছি যে মহানাস্তিকেও আমার প্রভাব লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। তোমার পুত্রকে আনিও, আমি যাহা বলিব—তাহাই সে বিশ্বাস করিবে।

বাস্তবিক ঘটিলও তাই। মাতার সঙ্গে কয়েকদিন ব্রহ্মচারিণীর কাছে যাতায়াতের পরে শশাঙ্কও বিশ্বাস করিয়া ফেলিল যে, তাহার পত্নীর ডাকিনীর অংশে জন্ম—সেইজন্তই তাহার শরীর খারাপ হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মচারী মাতার প্রদত্ত ঔষধ পত্নীর হাতে বাঁধিয়া দিলে তাহাদের উভয়েরই

মঙ্গল। শশাঙ্ক এই কাজে সম্মত হইল—কতকটা বা পত্নীর মঙ্গল কামনায়, কতকটা বা নিজের ইষ্ট চিন্তায় কতকটা মায়ের কান্নাকাটিতে, কতকটা ব্রহ্মচারিণীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে।

মানুষ একান্তই ঘটনাচক্রের দাস। কে কি বিশ্বাস করিবে, কে কি কাজ করিবে তাহার খুব সামান্য অংশই নিজের ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করে। ঘটনার ব্যক্তিত্বের কাছে তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব অতিশয় দুর্বল। তার উপরে আবার শশাঙ্ক চিরদিন দুর্বল প্রকৃতির জীব—মাতার আশ্রয়ে থাকায় তাহার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাবালকত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মচারিণী মন্ত্রপূত সিন্দুরলুপ্ত মটরদানার মতো একটি বস্তু দিলেন। ইহা বধূর বামহস্তে বাঁধিয়া দিতে হইবে। মাতাপুত্রে যুক্তি করিয়া স্থির করিল, মল্লিকার জন্য এক জোড়া অনন্ত গড়িয়া লইয়া যাইবে, যাহার বাম হাতেরটির মধ্যে মটরদানাটি ভরিয়া দেওয়া থাকিবে। কাজেই মল্লিকার জানিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না—অথচ কাজ উদ্ধার হইয়া যাইবে।

মাতাপুত্র ও নিস্তারিণী দেবী তিনজনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন। নির্দেশমতো অনন্ত গড়া হইল—এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মচারিণীর ঔষধ ভরিয়া দেওয়া হইল। এইবার তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে দেশে রওনা হইলেন—সঙ্গে নিস্তারিণী দেবীও চলিলেন।

৪

মাঝ রাত্রে শশাঙ্ক ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিল শুভ্র কোমল শয্যার একান্তে মল্লিকা পড়িয়া ঘুমাইতেছে—জানলা দিয়া অবারিত জ্যোৎস্নার ধারা আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে—শুভ্র শয্যায় শুভ্রতরা রমণী—যেন রজনীগন্ধার বনে মূর্ছিত জ্যোৎস্না। এই মল্লিকাই কি ডাকিনী?

তাহার বিশ্বাস হইল না। সেদিন ব্রহ্মচারিণীর কাছে যাহা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা হয় নাই—আজ তাহা মিথ্যার চেয়েও মিথ্যা মনে হইল। না এ হইতেই পারে না। কিন্তু তবু তো সে এই বিশ্বাসের বশেই কাজ করিয়াছে—এই বিশ্বাসের বশেই ঔষধভরা অনন্ত জোড়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছে।

কাশী হইতে ফিরিয়া অনন্ত জোড়া মল্লিকার হাতে দিয়া শশাঙ্ক বলিয়াছিল—পরো, নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার।

মল্লিকা পুছিয়াছিল—আচ্ছা এর নাম অনন্ত কেন?

শশাঙ্ক বলিয়াছিল—দেখ্ছ সাপের আকারে গড়া—সাপের নাম যে অনন্ত। তারপর বলিয়াছিল—এ যে আমার অনন্ত ভালবাসার প্রতীক।

মল্লিকা বলিল—অনন্ত, তবু অন্ত আছে। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—কোন্ ভালবাসার বা অন্ত নাই!

সে কি তখন স্বপ্নেও জানিত ওই অনন্ত কি বিষম বিষ বহন করিয়া তাহার বাহুযুগলকে জড়িত করিল?

শশাঙ্কর চোখে সেই অনন্ত জোড়া পড়িল। ইচ্ছা করিল টান মারিয়া তাহা খুলিয়া ফেলে—ইচ্ছা করিল সকল কথা তাহাকে বলিয়া মার্জনা চায়। কিন্তু দুর্বল প্রকৃতির পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হইল না—বধূর পাশে শুইয়া পড়িল। তাহাকে নিকটে টানিতে গেলে ঘুমের মধ্যে মল্লিকার বাহু তাহাকে আঘাত করিল—বাম হাতের অনন্ত অতর্কিতে তাহাকে জোরে লাগিল। শশাঙ্ক তাকাইয়া দেখিল অনন্তের লাল পাথর বসানো চোখ জ্যোৎস্নায় সাপের চোখের মতো জ্বলিতেছে। শশাঙ্ক দূরে সরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শশাঙ্কদের সংসারে তাহাদের দূরসম্পর্কিত এক পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালিকা প্রতিপালিত হইত। কালো মোটাসোটা মেয়েটি, মুখ কৌতুক-

কৌতূহলে ভরা। তাহার সঙ্গে মল্লিকার সবচেয়ে বেশি স্নেহের সম্পর্ক ছিল। সে যে নিজে ওর মতই পিতৃমাতৃহীন। মেয়েটির নাম ফডিং। মল্লিকা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিত—কুমড়ো। সন্ধ্যা হইলেই কুমড়ো তাহার শয্যায় আসিয়া আশ্রয় লইত—বলিত মল্লিকা মাসি একটা গল্প বলো।

সেদিন কুমড়ো আসিয়া বলিল—মল্লিকা মাসি একটা গল্প বলো—তোমাদের দেশের গল্প। মল্লিকা কলিকাতার গল্প বলিতে উদ্যত হইলে কুমড়ো বলিল—ও গল্প নয়, তোমার দেশের গল্প।

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—কেন কল্‌কাতাই তো আমার দেশ।

কুমড়ো মাথা নাড়িয়া বলিল—না, আমি শুনেছি তোমার দেশ অন্যখানে।

বিস্মিত মল্লিকা বলিল—অন্যখানে কোথায় আবার ?

কুমড়ো বলিল—হুঁ, ফাঁকি দিলে চলবে না—তোমার দেশ কামরূপ কামিখ্যে !

এবারে মল্লিকা হাসিয়া ফেলিল—বলিল ও-কথা আবার কে বললে ?

কুমড়ো বলিল—কেন সবাই তো জানে—সবাই তো বলে। তোমার বাড়ী কামরূপ কামিখ্যে—তুমি ডাকিনী ! তারপরে থামিয়া বলিল—আচ্ছা মাসি ডাকিনীরা নাকি আকাশ দিয়ে চলে ? তুমি আকাশ দিয়ে যদি উড়ে যেতে পারো তবে দার্জিলিং যাবার সময়ে পাল্কী করে গেলে কেন ?

মল্লিকা বলিল—দূর পাগলি আমি ডাকিনী হতে যাবো কেন ?

কুমড়ো বুঝিল, মাসির এখানে তাহাকে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা। ডাকিনী-জীবনের পরম লোভনীয় গল্পগুলি না শুনিতে পারিলে আর মাসির প্রিয়পাত্র হইয়া লাভ কি ?

সে বলিল—কাশী থেকে ওই যে বুড়ি এসেছে সে সব কথা বলেছে। তুমি ডাকিনী—মানুষের রূপ ধরে আছো। রাতের বেলায় সকলে ঘুমোলে ছাদ ফুটা করে একখানা হাড় হ'য়ে আকাশ দিয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে যাও—আবার ভোরবেলা ফিরে এসে মানুষ হ'য়ে ঘুমিয়ে থাকো।

ইহা শুনিয়া মল্লিকা হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল—ছি কুমড়ো—ও কথা বলতে নেই। তোমার মেসো মশাই শুনলে রাগ করবেন।

কুমড়ো বলিল—রাগ করবেন না ছাই। তুমি ভাবছো মেসো মশাই জানেন না। তিনিও জানেন। তিনিই তো তোমাকে ওষধু পরিয়ে দিয়েছেন!

মল্লিকা বলিল—ওষুধ আবার কই?

—কেন ওই অনন্ত জোড়া—ওরই বাঁ হাতেরটিতে বাবা বিশ্বনাথের ওষুধ ভরা আছে। পাছে তুমি জানতে পারো ব'লে অনন্তের মধ্যে ভ'রে দেওয়া হ'য়েছে।

মল্লিকা বিস্ময়ে, ক্রোধে, হতাশায় চুপ করিয়া রহিল। গল্প জমিবার আশা নাই দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কুমড়ো প্রস্থান করিল।

মল্লিকা ডাকিনী—শশাঙ্ক একথা বিশ্বাস করে—অনন্তের মধ্যে ওষুধ ভরা—সব কেমন বিপর্যয়কর ঘটনা। একমুহূর্তে চিরদিনের চেনা পৃথিবী যেন ওলট-পালট হইয়া গেল!

কাশী হইতে শশাঙ্কদের প্রত্যাবর্তনের পরে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে এতক্ষণে সে-সব নূতন অর্থে তাহার চোখে নূতন আকার ধারণ করিল।

তাহার মনে পড়িল নিস্তারিণী বুড়ি গোড়া হইতেই তাহাকে ভাল চোখে দেখে নাই। সে পারৎপক্ষে মল্লিকার সঙ্গে কথা বলিত না। কিন্তু অন্তদের সঙ্গে মল্লিকার কথা যে বলিত তাহাতে সন্দেহ নাই—

কারণ মল্লিকা আসিয়া পড়িলেই চুপ করিয়া যাইত—সকলের সঙ্গে একটা অর্থভরা ইসারার বিনিময় হইত। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের তাহার কাছে আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাশের বাড়ীর ছোট ছেলেটিকে একবার সে কোলে লইয়াছিল অমনি তাহার মা ছুটিয়া আসিয়া কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেল—অথচ কাশী হইতে ইহারা ফিরিবার আগে ছেলেটা সারাদিন মল্লিকার কাছেই থাকিত। ঠাকুর ঘরে মল্লিকার প্রবেশ একপ্রকার নিষেধ হইয়া গিয়াছিল—ঢুকিতে গেলেই অম্বামরীর সতত-সতর্ক চোখ তাহা ধরিয়া ফেলিত—অমনি হুকুম হইত—বৌমা ওদিকে আবার কেন? কিম্বা ওখানে তোমার কি দরকার বৌমা!

সে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ আবার কি রকম বিপদ? কিসে ইহার সমাধান, কোথায় ইহার সান্ত্বনা? শশাঙ্কও নাকি তাহার ডাকিনীত্বে বিশ্বাসী!

বাড়ীর মধ্যে প্রাচীর ঘেরা একটি ফুল বাগান ছিল, কেহ যত্ন লইত না বলিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছিল—কোন গাছে কখনো বা ফুল ধরিত, কখনো ধরিত না। শশাঙ্ক কাশী বেড়াইতে গেলে সময় কাটাইবার জন্ত মল্লিকা সেই বাগানের যত্ন লইত। বাগানের একান্তে একটা জবা গাছ ছিল। গাছটায় ফুল ধরিত না। মল্লিকার যত্ন ও জল পাইয়া গাছটা অজস্র ফুলে ভরিয়া গেল। মল্লিকা বলিল—ভালই হ'ল, মা কাশী থেকে ফিরলে জবাফুলের অভাব হবে না। কিন্তু অম্বামরী ফিরিবার পরও সে ফুল পূজার জন্ত সংগৃহীত হইত না। মল্লিকা একদিন শাশুড়ীকে ওই ফুল লইবার জন্ত বলিয়াছিল—শাশুড়ী কোন উত্তর দেন নাই—তার পরিবর্তে নিস্তারিণী বুড়ি উত্তর দিয়াছিল—ও ফুল অশুচি—পূজায় দিতে নেই। তখন মল্লিকা ভাবিয়াছিল কাশীবাসিনী হয়তো পূজায় পুষ্প

নির্বাচনের এমন কোন গূঢ় রহস্ত জানে—যাহা তাহার জানা নাই। কিন্তু আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ডাকিনীর হাতে-ফোটা ফুল দেব-পূজায় নিষিদ্ধ!

কিন্তু শশাঙ্কও যে এই নিদারুণ মিথ্যায় বিশ্বাসী, এই কথাটা তাহার মর্মে নিরন্তর খোঁচা দিতে লাগিল।…কিন্তু সত্যই কি সে তাহাকে ডাকিনী বলিয়া বিশ্বাস করে?…দূর ছাই, এত চিন্তায় কাজ কি? হাতেই তো প্রমাণ আছে। কুমড়ো বলিল—বাম হাতের অনন্তের মধ্যে ডাকিনী তাড়াইবার ঔষধ বর্ত্তমান। কুমড়ো এসব কথা কাণা-ঘুষায় না শুনিলে বলিবে কেমন করিয়া?

মল্লিকা একটা নোড়া সংগ্রহ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপরে অনন্ত জোড়া খুলিয়া বাম হাতেরটিতে সবলে আঘাত করিল—এক আঘাতেই অনন্ত ভাঙিয়া গিয়া ভিতর হইতে সিন্দুর লিপ্ত একটা মটরদানার মতো বস্তু বাহির হইয়া আসিল। সেই বস্তুটিকে হাতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে দেখিল—চিনিতে পারিল না, কি। তবু সে ভাবিল—ইহা স্যাঁকরার অনবধানতাপ্রযুক্ত কোন বাজে জিনিষ হইলেও হইতে পারে—দেখা যাক্ ডান হাতেরটিতে কি আছে? তখনি সে আর এক আঘাতে ডান হাতের অনন্তখানা ভাঙিয়া ফেলিল—কিছুই বাহির হইল না—সব শূন্ত। সেই রুদ্ধ নির্জন ঘরে, শূন্ত মেঝের উপরে, জ্যোৎস্নার আলোর সেই ঔষধটি হাতে করিয়া সে মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল। কেবলি মনে হইতে লাগিল—সে ডাকিনী, সে ডাকিনী, তাহাকে তাড়াইবার জন্ত এত ঔষধ, এত ষড়যন্ত্র, এত আয়োজন। সে-ও তবে দুর্বল নহে, তাহারও বিষম শক্তি আছে! হঠাৎ সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—তার পরেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। শশাঙ্ক কয়েক দিনের জন্ত কলিকাতায় গিয়াছিল বলিয়া রাত্রে দরজা খুলিতে

হইল না। ডাকিনী আহার করিল কি না করিল, সে সন্ধান করিবার প্রয়োজনও কেহ অনুভব না করাতে সারারাত্রির মধ্যে কেহ তাহাকে ডাকিল না। পরদিন প্রত্যুষে মল্লিকা এক নূতন জগতে এক নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিল।

৫

মল্লিকা বাড়ীর লোকের সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। আগে সে মিশিতে চেষ্টা করিত—লোকে এড়াইয়া চলিত। এবারে চেষ্টাও পরিত্যাগ করিল, স্বামী থাকিলে তাহার সঙ্গে মিশিত—কিন্তু এখন তাহার মনে পড়িল ইদানীং স্বামীও যেন তাহাকে এড়াইয়া চলে। কয়েকদিন আগে শশাঙ্ক কাজের নাম করিয়া কলিকাতায় গিয়াছে—অনেক কয়েকদিন হইয়া গেল, আসিবার নাম নাই। ইহাও কি তাহাকে এড়াইয়া চলিবার একটা পন্থা নয়! মল্লিকা জানিত না বটে, কিন্তু কথাটা সত্য নিস্তারিণী আসিয়াই অন্নময়ীকে বুঝাইয়াছিল যে, ছেলেকে যতটা সম্ভব মল্লিকার কাছ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অবশ্য হাতে ঔষধ থাকা পর্যন্ত কোন ভয় নাই—তবু সাবধান হইতে দোষ কি? তাহার পরামর্শেই অন্নময়ী পুত্রকে কাজের অছিলায় কলিকাতা পাঠাইয়াছেন—এবং নিত্য নূতন কাজের ফরমাস পাঠাইয়া তাহার প্রত্যাবর্তনে বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। মল্লিকা এত খবর রাখিত না কিন্তু স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির বলে তাহার অনুমান প্রায় ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়াছিল।

বাড়ীতে স্বামী নাই—অন্যান্য কাহারো সঙ্গে সে মেশেনা কাজেই মল্লিকা যেন লোক-সমাজে থাকিয়াও লোকসমাজের বাহিরে গিয়া পড়িল। প্রেততাত্ত্বিকেরা বলেন লোকের ভিড়ের মধ্যেই ছায়া শরীরীরা বিচরণ

করিতেছে—মানুষে তাহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিতেছে না—কিন্তু উভয়পক্ষই যে আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মল্লিকা ও বাড়ীর সকলের মধ্যে যেন সেই সম্বন্ধ। সে কাছে থাকিয়াও দূরে, ঘরের বধূ হইয়াও ঘরের নয়, মানুষ হইয়াও ডাকিনী। কেবল একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। লম্বা হাতার জামা পরিয়া অনন্তশূন্য বাহুদ্বয় ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

একবার সে ভাবিল শশাঙ্ককে চিঠি লিখিয়া জানাইবে। কিন্তু কি লিখিবে? তিনিও তো এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন। তবে সেই কথাই সে না লেখে কেন? কিন্তু ইহার তো কোন প্রমাণ নাই, ছোট একটা মেয়ে কি বলিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া লিখিলে তিনি তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি হাসিয়া উড়িয়াই যায় তবে ক্ষতি কি? সংসারের এই তো বিপদ্! অনুমানের সত্যকে প্রমাণের সত্য করিয়া তোলা যায় না বলিয়াই কি অনুমানের সত্য তুচ্ছ? এইভাবে দিন যায় এবং রাত্রিও যায়। মল্লিকা ক্রমাগত মনে মনে জপিতে থাকে সে নাকি ডাকিনী। যতই সে এই কথা ভাবে ততই বাড়ীর সকলের প্রতি তাহার ধিক্কারের ভাব গভীরতর হয়—একসঙ্গে ধিক্কার, ক্রোধ, বিরক্তি, নৈরাশ্য, দুঃখ আরো কত কি? তাহার ইচ্ছা করে সকলের কাছে প্রমাণ করিয়া দেয় সে তাহাদের আর দশজনের মতোই সাধারণ মানুষ! কিন্তু প্রমাণ করিবে কি করিয়া? তাহাদের অনুমানের সত্যকে কি করিয়া সে অপ্রমাণ করিবে?

একদিন দুপুরবেলা নির্জন ঘরে আয়নায় নিজের ছায়া দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। একি, তাহার এ কেমন চেহারা হইয়া গিয়াছে! ওই আয়নাখানা যেন একটা সুড়ঙ্গ পথের একটা মুখ তাহার মধ্য দিয়া আর এক দিকের, আর এক জগতের কোন্ ছায়াময়ী দৃশ্যমান?

বাস্তবিক ছায়াময়ীই বটে। মল্লিকা কৃশ হইয়া গিয়াছে, মল্লিকার মতো স্নিগ্ধ রঙের উপরে একটা তীক্ষ্ণতা নামিয়াছে, বসনের শুভ্রতা আর গায়ের রঙের শুভ্রতা, সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন যেন একটা শাণিত অসির ভাব! চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, মুখে এমন একটা হাসির রেখা—যাহাতে তরবারির দীপ্তি ও তরবারির শীতলতা দুই-ই মিশ্রিত আছে। নিজের ছায়া দেখিয়া সে নিজেই চমকিয়া উঠিল। সামান্য কয়দিন সে আয়নায় প্রসাধন করে নাই—এরই মধ্যে তাহার একি পরিবর্ত্তন! সে হাসিয়া ভাবিল—একেই তো ডাকিনীতে পাওয়া বলে। আমি তো আর মানুষ নই।

ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নিতান্ত নাস্তিকেও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে, মল্লিকা ডাকিনী ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রামের বদি হাড়ীর ছোট ছেলেটার তড়কা হইল। লোকে বলিল, ছেলেটাকে ডাইনিতে পাইয়াছে—এখন চৌধুরী বাড়ীর বৌমার দয়া ছাড়া আর রক্ষা নাই। বদি ছেলেটাকে লইয়া এক দৌড়ে চৌধুরী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় যেখানে মল্লিকা একা বসিয়াছিল—সেখানে গিয়া ছেলেটাকে তাহার কোলে ফেলিয়া দিয়া একেবারে তাহার পা জড়াইয়া ধরিল।

মল্লিকা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—একি! একি!

বদি পা না ছাড়িয়া বলিল—বৌমা এবার তোমার দয়া ছাড়া উদ্ধার নাই। ছেলেটাকে রক্ষা করো।

মল্লিকা বলিল—ওর যে গা গরম দেখছি। ইস খুব জ্বর। তড়কা হয়েছে।

বদি বলিল—তড়কা নয় বৌমা। ডাকিনীর কৃপা হয়েছে—তুমি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে?

মল্লিকা বুঝিল তাহার নূতন পরিচয় সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, এই ছেলেটার পরিবর্তে তাহার মৃত্যু হয় না! ইতিমধ্যে দু'চারজন করিয়া লোক জড় হইতে লাগিল। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্যও বটে, ছেলেটাকে বাঁচানো যায় কিনা দেখিবার জন্যও বটে, সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল এবং জল ও ইউ ডি কোলন মিশাইয়া ছেলেটার মুখে মাথায় দিতে লাগিল। অল্পেই ছেলেটা তড়কা ভাঙিয়া সুস্থ হইল। তখন সে ছেলেটাকে আনিয়া তাহার মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিল। বদি আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়া গলার রূপার মালাটা এক টানে ছিঁড়িয়া মল্লিকার পায়ের উপরে রাখিল—বলিল—বৌমা দয়া করে এটা তুমি নাও।

বদি আর কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান করিল। কিন্তু দর্শকের ভিড় সরিল না। অম্বাময়ী ও নিস্তারিণীও এই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন। দুইজনে পরস্পরের দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। এমন সময়ে নিস্তারিণীর ইঙ্গিতে অম্বাময়ী বলিয়া উঠিলেন—তোমার অনন্ত কোথায়? মল্লিকা দেখিল ব্যস্ততায় জামার হাতা সরিয়া গিয়াছে। সে বলিল—খুলে রেখেছি।

অম্বাময়ী কঠোর স্বরে বলিলেন—খুললে কেন? আবার পরো।

মল্লিকা বলিল—খুলে ফেলে দিয়েছি—আর পরবো না। নিজের স্বরের কঠোরতায় সে বিস্মিত হইয়া গেল। সাধারণ বধূ হইলে এমন অবাধ্যতার জন্য দণ্ডের অন্ত থাকিত না। কিন্তু ডাকিনীর উপরে ক্রোধ প্রকাশ করিতে অত্যন্ত দুর্দান্ত শাশুড়ীরও ভয় হয়। ডাকিনী হইবার কিছু সুবিধাও আছে। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইল যে, মল্লিকা ডাকিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্নপূর্ণা ও নিস্তারিণী নিভৃতে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা পুছিলেন—এখন কি করা যায়?

নিস্তারিণী বলিলেন—যতদিন ওষুধ ছিল ভয়ের কিছু ছিল না। ওষুধ ফেলে দেবার পরেই তো প্রকোপ সুরু হয়েছে।

চিন্তিত অন্নপূর্ণা বলিলেন—কিন্তু এখন উপায় কি?

নিস্তারিণী বলিলেন—উপায় আর কি? ওঁরা সব দেব-অংশী। ঘাঁটাঘাটি করা কিছু নয়। এখন উনি নিজ ইচ্ছায় গেলেই বেশি মঙ্গল।

অন্নপূর্ণা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন—যত তাড়াতাড়ি যায় ততই ভালো। বাছা আমার ফিরে আসবার আগে যায় না!

নিস্তারিণী বলিলেন—জোর করা তো যায় না দিদি। উনি ক্রুদ্ধ হলে বাছার ক্ষতি করতে পারেন।

পুত্রের ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় অন্নপূর্ণা শিহরিয়া উঠিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন।

মল্লিকার সঙ্গে কেহ মিশিত না—ইহা আগেই বলিয়াছি, কেবল ঐ অনাথ বালিকাটি মিশিত। কুমড়ো আসিয়া মল্লিকাকে বলিল—মাসি, সবাই তোমাকে ভয় করে, কেবল আমিই ভয় করি না।

তারপরে বলিল—ভয় করবো কেন? তুমি তো আমাদেরি মতো মানুষ। ওরা বলে তুমি ডাকিনী। হও না কেন ডাকিনী, আমার মাসি বটে তো! তুমি আমার ডাকিনী মাসি।

মল্লিকা কহিল—ওরা আর কি বলে রে?

কুমড়ো বলিল—একদিন কর্তা দিদি আর কাশীর দিদি বলাবলি করছিল—আমি সব শুনে ফেলেছি। শীগ্‌গীরই নাকি তুমি উড়ে চলে যাবে—ওরা কালীর থানে পুজো দিয়েছে।......আচ্ছা মাসি, তুমি

আমাকেও নিয়ে যাও না কেন? আমার তো কেউ নাই—এরা আমাকে কেউ দেখতে পারে না।

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—যাবি আমার সঙ্গে?

কুমড়ো সাগ্রহে বলিল—যাবো বই কি। ছাদ ফুটো করে দু'জনে উড়ে চলে যাবো। প্রথমে যাবো কামরূপ কামিখ্যে—তারপরে, যাবো শ্রীক্ষেত্রে! সে বেশ হবে মাসি। যাবার সময়ে এই বাড়ীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে—দেখবো ওরা কি করে?···আবার একটু থামিয়া বলিল—

হাঁ মাসি কবে যাবে?

মল্লিকা বলিল—শীগ্‌গিরই।

'সে বেশ হবে' বলিতে বলিতে কুমড়ো আনন্দে প্রস্থান করিল—বোধ হয় জিনিষপত্র বাঁধিবার জন্যেই।

মল্লিকা বুঝিল—এবার তাহার যাওয়াই ভালো। কিন্তু কোথায় যাইবে? কোনখানে তো তাহার কেহই নাই—পৃথিবীর কোথাও তাহার তিলমাত্র আশ্রয় নাই। অবশ্যই যাইতে হইবে এবং শীঘ্রই··· কিন্তু কোথায়? চিন্তা করিয়া করিয়া মল্লিকা এ প্রশ্নের কোন কিনারা পাইল না।

ডাকিনী হইবার অসুবিধার মধ্যেও একটা সুবিধা মল্লিকা পাইয়াছিল—নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা। সে যখন খুসি ঘুমাইত, যখন খুসি আহার করিত—আর সবচেয়ে সুবিধা ছিল রাত্রিবেলার চৌধুরী বাড়ীর ছাদে ছাদে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ বাধা দিত না, নিষেধ করিত না। গভীর রাত্রে এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে ঘুরিতে ঘুরিতে তেতালার যে-ছাদটা গুড়নদীর ঠিক উপরেই তাহার উপরে আসিয়া দাঁড়াইত। দেখিত অনেক নীচে গুড়নদীর কালো জলে তারার

ছায়া,—দেখিত নদীর ধারে দূরে চিতার আলো নির্বাপিতপ্রায়, দেখিত নদীর ওপরে পুঞ্জিত অন্ধকারে জোনাকীর ঝলমলানি; কান পাতিয়া শুনিত, দিনের বেলায় অশ্রুত গুড়নদীর ছল ছল ধ্বনি, আর শুনিতে পাইত প্রহর-গোনা যামঘোষের দিগন্তজোড়া ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত রব। তারপরে এক সময়ে নিশান্তের শীতল বাতাসে সচকিত হইয়া ক্লান্ত শরীরটাকে টানিয়া আনিয়া শূন্য শয্যায় ফেলিয়া কখন্ ঘুমাইয়া পড়িত। ছাদে বেড়াইবার সময়ে সে জানিত, জানালা দরজা আলিসার আড়াল হইতে অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

৬

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শশাঙ্ক ফিরিয়া আসিল। রাত্রি তখন অনেক। ষ্টেশনেই সে আহারাদি সারিয়া আসিয়াছিল—কাজেই আসিয়াই সে নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। মল্লিকা অকস্মাৎ স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। শশাঙ্কও তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মল্লিকা, তোমার হাতের অনন্ত গেল কোথায়?

মল্লিকা একবার রিক্তবাহুর দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল,—ভেঙে ফেলে দিয়েছি। ভীতবিস্ময়ে শশাঙ্ক বলিল, কেন?

মল্লিকা এবার হাসিল, বলিল—বুঝতে পারো না! আমি যে ডাকিনী।

শশাঙ্কর অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল—একি পরিহাস, না সত্য?

এবার সে ভালো করিয়া মল্লিকাকে লক্ষ্য করিল। জানালা দিয়া নির্গলিত জ্যোৎস্নার ধারাতে সে দাঁড়াইয়া, শাড়ীর শাদা জমিনে আপাদ-কণ্ঠ আবৃত; চুল-এলায়িত; কালো চুলের দ্বন্দ্বে বসনের শাদা, রঙের শাদা, জ্যোৎস্নার শাদা, হাসির শাদা—সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন যেন একটা

অতীন্দ্রিয় শুভ্রতা। সেই ঋজুশুভ্র অনতিদীর্ঘ নারীমূর্তি যেন কোন্ দুষ্ট অদৃষ্টের একখানি শাণিত তরবারি! সে দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল।

মল্লিকা বলিল—বসো।

কিন্তু নিজের শয্যায় আসিয়া বসিবার সাহস শশাঙ্কর হইল না। কিছু দিন আগে যে মল্লিকাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এ যেন সে মল্লিকা নয়। সংসারের ধূমে মলিন ম্লান চিরপরিচিত নারীকে অলৌকিকের শানপাথরে ঘসিয়া কে যেন অন্তর্নিহিত দীপ্তিময়ী লোকত্তরাকে বাহির করিয়াছে। এত কথা হয়তো তাহার মনে হইত না, কিন্তু যতদিন সে কলিকাতায় ছিল প্রায় প্রতিদিনই মার পত্র পাইত যাহাতে থাকিত এই ডাকিনীর নিত্য নব কার্যকলাপের পরিচয়—তার কতক সত্য, কতক মিথ্যা। সবই কল্পনার তুলিতে জলন্ত বর্ণে অঙ্কিত। সেই সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত করিয়া আজ যাহাকে যে দেখিল সে আর তাহার পত্নী নহে—পত্নীরূপিনী ডাকিনী।

শশাঙ্ক অস্ফুটস্বরে বলিল—তুমি কে?

মল্লিকা স্থির কণ্ঠে বলিল—আমি ডাকিনী। আমার দেশ কামরূপ কামিখ্যে। আমি গভীর রাত্রে ছাদ ফুটো করে কঙ্কাল হয়ে আকাশপথে উড়ে যাই—কামরূপ থেকে শ্রীক্ষেত্রে কত পাহাড় পর্বত, নদনদীর উপর দিয়ে, কত দেশ বিদেশ পার হয়ে। ওঃ সে কি আনন্দ! তারপরে ভোর হবার আগে মানুষ হয়ে তোমার পাশে আবার শুয়ে ঘুমোই।

শশাঙ্ক কাঠের মতো দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মল্লিকা বলিল—চলো না একদিন আমার সঙ্গে। যাবে?

শশাঙ্ক আর সহ্য করিতে পারিল না—সে মাগো শব্দ করিয়া ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সেই সঙ্কুচিত পলায়নের দৃশ্যে মল্লিকা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি যেন কঙ্কালের

শীর্ণ শুভ্র হাত বাড়াইয়া শশাঙ্ককে ধরিবার জন্ম পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। শশাঙ্ক একেবারে তাহার মায়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

অন্নময়ী চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র—সারা গায়ে ঘাম—ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহাকে শান্ত করিয়া শুধাইলেন—এসেই বুঝি ঘরে গিয়েছিলি? আমাদের একবার পুছতে হয়। হাতে ওষুধ বেঁধে দিতাম, তবে ঢুকতিস। বল্ বল্, কি হয়েছে?

শশাঙ্ক সব খুলিয়া বলিয়া শেষে বলিল—মা ওযে আমাকেও সঙ্গে যেতে বলে। শঙ্কিত অন্নময়ী 'ষাট ষাট' বলিয়া পুত্রের মাথায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া দিলেন এবং অবশেষে ইহার একটা বিহিত করিবার জন্ম মল্লিকার ঘরের দিকে চলিলেন। তিনি একেবারে গলবস্ত্র হইয়া মল্লিকার কাছে গিয়া বলিলেন—ওগো, তুমি দেবী দানবী ডাকিনী যোগিনী যেই হও, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করি নাই। তুমি স্বেচ্ছায় এ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলে আবার স্বেচ্ছায় এখান থেকে নিজের দেশে প্রস্থান করো।

এই বলিয়া তিনি গললগ্নীকৃতবাস হইয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাতার পিছনে দাঁড়াইয়া পুত্র কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। মল্লিকা মাতাপুত্রের এই স্বাস্থ্যভাব দেখিয়া একবার হাসিল—বলিল—তাই যাবো। এই বলিয়া সে উভয়ের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময়ে একবার স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিল। তাহার দিক হইতে কোন সাড়া আসিল না—কাঠের পুতুল কি সাডা দিবে?

মল্লিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া অকম্পিত পায়ে তর্ তর্ করিয়া ছাদে গিয়া উঠিল। এক মুহূর্তের জন্ম দ্বিধা করিল না—নিজের কর্তব্যের ছক যেন সম্মুখে বিস্তারিত।

মল্লিকা ছাদ হইতে অন্য ছাদে, নিম্নতর হইতে উচ্চতর ছাদে গিয়া উঠিল এবং শেষে চারতলার চিলে কোঠার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মল্লিকা উর্ধ্বে তাকাইয়া দেখিল চৈত্র পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দিগদিগন্তব্যাপিয়া শুভ্র-নৈরাশ্যের তাঁবু কানাৎ টাঙাইয়া দিয়াছে—তাহারি উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়ে চাঁদ শূন্যে ঝুলিতেছে, আরও না জানি কি বিস্ময় সঞ্চিত আছে। নীচে যতদূরে চোখ চলে সুপারি নারিকেলের মাথাগুলি তালে তালে দোলাদুলি করিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। মল্লিকার মনে হইল বাতাস উঠিয়াছে। পাল খুলিয়াছে, কাছিতে টান পড়িয়াছে। আর দেরী নয়। তাহার মনে হইল যে বাতাসে এখানকার সুপারি নারিকেলের মাথা দুলিতেছে সমুদ্রের ঢেউয়ে সে বাতাস কি কাণ্ডই না জানি করিতেছে। সুদূর সমুদ্রে জোয়ারের জল এতক্ষণ পূর্ণতার রেখা ছাড়াইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর তীরে তীরে যত গুহা কন্দর আছে লবণাম্বুতে পূর্ণ হইয়া এতক্ষণে গদ্ গদ্ ভাষায় বেদনার কি স্তবোচ্চারণই না করিতেছে! সেই ব্যথার টান কি এই শুষ্কপ্রায় গুড়নদীর নাড়ীতেও আজ রাত্রে লাগে নাই? মল্লিকার মনে হইল আজ ব্যথার জোয়ার, নৈরাশ্যের হোলি। নিম্নে উর্দ্ধে কোথাও আজ পরিত্রাণ নাই, পরিচিত দিগন্ত' আশ্রয়ের তীর ধুইয়া মুছিয়া কোথায় সব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মল্লিকা দেখিল এই সর্বপ্লাবী বন্যার মুখে কোথাও তাহার কোন আশ্রয় নাই; না পতিকূলে, না পিতৃকূলে, সংসারের সব দিগন্ত কোন সর্বনাশের তলায় নিশ্চিহ্ন। এই প্রলয় পয়োধির মুখে কোন্ বটপত্রকে অবলম্বন করিয়া সে বাঁচিবে? কোথাও যে তাহার কোন আশ্রয় নাই। আর সর্বনাশের মুখে একটুখানি বাঁচাইয়া রাখিয়া কি লাভ? মল্লিকা তাকাইয়া দেখিল, অতি নিম্নে গুড়নদীর রূপার পাত জ্যোৎস্না চিক্কণ শীতল একটি বটপাতার মতো বাতাসে কাঁপিতেছে।

আবার বাতাস উঠিয়াছে, সুপারিনারিকেলের মাথাগুলির কি হায় হায় হাহাকার! দূরের গাছের মাথা, অদূরের গাছের মাথা, নিকটের গাছের মাথা, পায়ের তলাকার গাছের মাথা এবং শেষে মল্লিকার আঁচল বাতাসে উড়িতে লাগিল। দূরের বাতাস কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—আর বিলম্ব নয়। তাঁবুর উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়েটা। অনেকক্ষণ হইল ঝুলিতেছে—এবারে লাফাইয়া পড়িবে—আর বিলম্ব নয়- ওর আগেই…

মল্লিকা চিলে-কোঠার ছাদে উঠিয়া একবার পৃথিবীটা নিরীক্ষণ করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মাগো রব করিয়া অতি নিম্নে গুড়নদী লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিল।

জানালা দরজার আড়াল হইতে একদল কৌতূহলী চক্ষু দেখিল ডাকিনী চিলে কোঠার ছাদে উঠিয়া স্বমূর্তি ধরিয়া কামরূপ কামিখ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যখন মল্লিকার মৃতদেহ নদীর জলে পাওয়া গেল, তখনো তাহাদের মত পরিবর্তন ঘটিল না। সবাই বলিল, ডাকিনী মানব দেহটা ফেলিয়া কঙ্কাল হইয়া উড়িয়া গিয়াছে—কামরূপ কামিখ্যের নরদেহে যাইবার উপায় নাই, মানুষের ঘরে মানুষের রূপে আসিয়াছিল—এবার স্বরূপ ধরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাই হোক, বাড়ীর ডাকিনী দূর হওয়াতে সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করিল এবং উত্তরোত্তর শশাঙ্কর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিতে লাগিল।

পেস্কার বাবু

জজের পেস্কার রতনমণি বাবু পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করিবার পরে পেন্সন লইলেন।

সেদিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। অন্যদিনের মতোই রতনমণি বাবু আদালতে আসিলেন, সেই বুকের কাছে প্লেট-দেওয়া পুরানো ধরণের শার্টের উপরে তৈলাক্ত চাদরখানা ভাঁজ করিয়া রক্ষিত, ঘরে ঢুকিয়াই দেওয়াল-ঘড়ির দিকে একবার তাকাইলেন, ঘড়িটা ঠিক চলিতেছে বলিয়া যেন তাহাকে উৎসাহ দিলেন, যেমন উৎসাহ দেয় ক্লাস-টিচার ঘরে ঢুকিয়া পাঠ-নিরত ভালো-ছেলেটিকে; তারপরে চেয়ারখানা রুমাল দিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া সন্তর্পণে বসিয়া পড়িলেন; চাদরখানা গলা হইতে খুলিয়া চেয়ারের হাতলে জড়াইয়া পকেট হইতে চশমার ভাঙা খাপটি বাহির করিলেন; চশমার কাঁচ যতই পরিষ্কার থাক্ না কেন কোঁচার খুঁট দিয়া অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরিয়া পরিষ্কার করিবেন; তারপরে চশমা পরিয়া লইয়া আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাইবেন—ভাবটা যেন বিনা চশমার দৃষ্টিতে ফাঁকি দিয়াছ কিনা এইবার দেখিব; ঘড়ি নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো চলিতেছে দেখিয়া সমর্থন-মূলক-ভাবে একবার হাসিবেন; তারপরে ভাঙা গলায় হাঁক দিবেন—রঞ্জন, জল! রঞ্জন আদালতের বেয়ারা—সে এক গেলাস জল আনিয়া দেয়। রতনমণি বাবুর নিজস্ব একটি চিহ্নিত গেলাস আছে। রঞ্জন তাঁহার গেলাসে একটা চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিল পাছে ভুল ভ্রান্তি হয়। সে সেই চিহ্নটা পেস্কার বাবুর দিকে ফিরাইয়া গেলাসটা হাতে দেয়, কিন্তু

তিনি এত সহজে ভুলিবার লোক নহেন, তাঁহার নিজের একটি গোপন চিহ্ন আছে, গেলাসটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটা দেখিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে জলটা আলগোছে পান করিয়া ফেলিয়া একটা তৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—গেলাসটা রঞ্জনের হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে বলেন—বেঁচে থাক্ বাপু! কেমন, বাড়ীর সব ভালো তো!

তাঁহার নিত্যকার নিয়ম এই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইলে অন্যান্য আমলারা আসিতে থাকে, দু'চারজন করিয়া উকীল বাবু আসিতে থাকেন—সবাই ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধ রতনমণি বাবুকে একটা করিয়া নমস্কার করে—কিন্তু তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তিনি স্তূপীকৃত নথীর গাদার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন—কেবল যখন জজসাহেব আসেন তখন তিনি যন্ত্র চালিতের মতো উঠিয়া একবার মাথা বাঁকাইয়া নমস্কারের ভঙ্গী করিয়া বসিয়া পড়েন—নথীর গাদার মধ্যে হইতে তখন তাঁহাকে টানিয়া বাহির করা সব সময়ে জজের সাধ্যেও কুলায় না।

ইহাই রতনমণি বাবুর নিত্যকার অভ্যাস—এই রকম পঁয়ত্রিশ বছর ধরিয়া চলিতেছে। অবশ্য প্রথমদিকে তিনি পেস্কার ছিলেন না—কিন্তু সে সব এখন স্মৃতির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। সহর সুদ্ধ লোক তাঁহাকে পেস্কারবাবু বলিয়া জানে, আদালত সংক্রান্ত সবাই তাঁহার অতি তুচ্ছ অভ্যাসটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

আদালতের সবাই জানিত টিফিনের সময়ে পেস্কার বাবুকে কোথায় দেখা যাইবে। উত্তরদিকের বটগাছটার তলায় কাঠের ঘরখানার মোতি ময়রার প্রসিদ্ধ সন্দেশের দোকান, সেখানে একটি কাঠের টুলের উপরে পেস্কার বাবু আসিয়া বসেন, ময়রা শশব্যস্তে কলার পাতে করিয়া দুটি বড় সন্দেশ রতন বাবুর হাতে দেয়—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে সন্দেশ দুটি গলাধঃকরণ করেন—তখন মোতি ঘটি হইতে তাঁহার হাতে

জল ঢালিয়া দেয়, তিনি পান করেন ; মোতির অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি গেলাসে জল গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। সত্য কথা বলিতে কি আমাদের রতনমণি বাবু একটু শুচিবায়ুগ্রস্ত। মোতি কলার পাতার ঠোঙায় টাটকা সাজা তামাকের কল্কেটি তাঁহার হাতে দেয়—রতনমণি বাবু ধূমপান করেন, অতিরিক্ত ধূমপানে তাঁহার গোঁফের প্রান্ত তামাটে হইয়া গিয়াছে। রতনমণি বাবু উঠিয়া পড়িতেই আর সকলে তাড়াতাড়ি জলযোগ ও বিশ্রাম সারিয়া নেয়—এবারে পুনরায় আদালত বসিবে। মোতি ময়রা পেস্কার বাবুকে বড খাতির করে—তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই অন্যান্য কর্ম্মচারী ও উকীলের মুহুরিরা তাহার দোকানে জলযোগ করে। মোতি রতনমণি বাবুর প্রিয় সন্দেশের নাম রাখিয়াছে 'পেস্কার-ভোগ'।

আমাদের রতনমণি বাবু কি ঘুষ লইতেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ যেমন বাতাসে বাস করে, আদালতের জীবগণ তেমনি ঘুষের মধ্যে বাস করে। কিন্তু রতনমণি বাবু সম্বন্ধে এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। তাঁহার বন্ধুরা বলে তিনি ঘুষ নিয়া থাকেন, শত্রুরা বলে ঘুষ লইবার মতো সাহস তাঁহার নাই। কিন্তু আমাদের মতো নিরপেক্ষ লোকের অভিজ্ঞতা এই যে তিনি ঘুষ নেন এবং নেন না। অর্থাৎ সারা বছর ঘুষ নেন না। কিন্তু বিজয়া দশমীর পরে যেদিন আদালত খোলে, সেদিনটা তিনি ঘুষ নিয়া থাকেন। সেদিন একখানা বড় রুমাল তাঁহার টেবিলের উপর পাতিয়া দেন, অর্থী, প্রার্থী, দারোয়ান, চাপরাশি, আমলাগণ এমনকি অনেক জুনিয়ার উকীল পর্য্যন্ত সাধ্যানুযায়ী টাকাটা সিকেটা দেয়। আদালত শেষ হইলে ভারি রুমাল খানায় তোড়া বাঁধিয়া একবার মাথায় ঠেকাইয়া পকেটে ভরিয়া তিনি বাড়ী যান এবং গৃহিণীকে ডাকিয়া সন্তর্পণে

তাহার হাতে দিয়া বলেন—'ভালো করিয়া তুলিয়া রাখিও—মায়ের আশীর্ব্বাদ।'

ইহাই রতনমণি বাবুর জীবনের রুটিন। ইহাই তাঁহার পঁয়ত্রিশ বছরের রুটিন, পঁয়ত্রিশকে তিন শ পঁয়ষট্টি দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায়—তাহার অভ্যাস, কেবল ছুটির ক'টা দিন ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেই রতনমণি বাবুর আজ আদালত জীবনের শেষ দিন—কাল হইতে তাঁহার পেন্সন জীবন সুরু হইবে।

আদালতের কাজ শেষ হইল মাত্র—নাজির বাবু আসিয়া রতনমণি বাবুর কানে কানে বলিলেন—পেস্কার বাবু—একবার এদিকে আসবেন। নাজির বাবুকে অনুসরণ করিয়া তিনি নাজির বাবুর আফিস ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বহুলোক সেখানে সমবেত—সবাই আদালতের কর্ম্মচারী, নাজির, সেরেস্তাদার হইতে চাপরাশী পর্য্যন্ত সবাই আছে।

তিনি নাজির বাবুকে কহিলেন—এ আবার কি?

নাজির বাবু তাঁহাকে একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—বসুন।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। রতনমণি বাবুর বিদায় উপলক্ষ্যে আদালতের কর্ম্মচারিগণ একটি প্রীতি সম্মেলনের অয়োজন করিয়াছে মাত্র।

সকলের সম্মতিক্রমে নাজির বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মুন্সেফের পেস্কার যে ছোকরাটি স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে জনার অভিনয় করিয়া মহিলাগণের অশ্রু ও ভদ্রমহোদয়গণের করতালি আকর্ষণ করিয়া থাকে সে হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া স্বরচিত সঙ্গীত আরম্ভ করিল—

"সত্যই কি তুমি যাবে চলে
আমাদের একা ফেলে—
মোরা অসহায়—"

করতালির মধ্যে সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে নাজির বাবুর আহ্বানে বক্তারা একে একে রতনমণি বাবুর গুণ বর্ণনা ও তাঁহার বিদায়ে তাঁহাদের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—আর রতনমণি বাবু মূঢ়ের মতো বসিয়া বসিয়া সমস্ত দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন—যেন ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য তিনি গ্রহণ করিতে অশক্ত।

অবশেষে সকলের বক্তব্য শেষ হইলে নাজির বাবু দু'চার কথায় মনোভাব প্রকাশ করিতে রতনমণি বাবুকে অনুরোধ করিলেন। রতনমণি বাবু উঠিয়া বলিলেন—'আজকার মতো যাওয়া যাক্—কাল আবার দেখা হবে।' এই বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল পেন্সার বাবু অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিলে না তাঁহার কণ্ঠস্বর কি রকম গদ্‌গদ্। লোকে যাহাই বলুক, আমরা জানি রতনমণি বাবু পেন্সন লইবার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই আদালতেই তাঁহার জীবন, এখানে তাঁহার জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়াছে, পঁয়ত্রিশ বছর তো অনেকেরই জীবনের আদ্যন্ত, সেখান হইতে যে একদা তাঁহাকে অকস্মাৎ বিদায় লইতে হইবে ইহা কখনও তিনি ভাবেন নাই—আজও তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন—'আজকার মতো যাওয়া যাক, কাল আবার দেখা হবে।'

সভা ভঙ্গে প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল—'পেন্সার-ভোগ' সন্দেশ। জলযোগান্তে যে যাহার গৃহে রওনা হইল—রতনমণি বাবুও নিত্যকার মতো চাদর খানা কাঁধের উপর ফেলিয়া আদালত ত্যাগ করিলেন।

পরদিনেও নিত্যকার মতো বেলা দশটায় চাদরখানা কাঁধের উপরে

কেলিয়া যখন রতনমণি বাবু বাহির হইতে উদ্যত, তখন গৃহিণী বলিলেন—কোথায় চল্‌লে আবার ?

রতনমণি বাবু নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন—কেন—আজ কি নতুন দেখ্‌ছ নাকি ? আমি দশটায় কোথায় যাই তা কি জানো না ?

বিস্মিত গৃহিণী বলিলেন—তোমার যে পেন্সন হয়েছে।

কিন্তু গৃহিণীর সব কথা তাঁহার কানে পৌঁছিল না, অনেক আগেই তিনি গৃহিণীর কণ্ঠস্বরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

আদালতে পৌঁছিয়া রতনমণি বাবু দেখিলেন যে, শ্যামাচরণ নামে একজন জুনিয়ার কেরাণী পেস্কার পদে উন্নীত হইয়া তাঁহার বহুকালের চেয়ারখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রতনমণি বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন ও তুমি এখানে বসেছ ? আচ্ছা ব'সো ব'সো, আমি ওঘরে বসছি। এই বলিয়া তিনি সেরেস্তাদারের ঘরে গিয়ে একখানা শূন্য চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে কেরাণীকুলে ও অর্থী প্রার্থীতে আদালত পূর্ণ হইয়া উঠিল। সবাই রতনমণি বাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ব্যাপার কি ? আবার তিনি কেন ? পেন্সন লইয়া মানুষে দুপুরটা সুখে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিবে। নতুবা কাশীবাস করিবে—কিন্তু রতনমণি বাবুর সবই নূতন !

সেরেস্তারদার পুছিলেন—দাদা, আপনি এখানে যে ?

রতনমণি বাবু প্রশ্নটা ভুল বুঝিয়া বসিলেন—হাঁ, আর আদালতে বস্‌বো না, ছেলেমানুষদেরও একটা সুযোগ দেওয়া চাই। তাই শ্যামা-চরণকে দিলাম ওখানে বসিয়ে। ছেলেমানুষ পাছে ভুলভ্রান্তি করে—তাই আমি রইলাম মাথার উপরে।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন, দাও, তোমাদের হাতে বেশি কাজ থাকলে দাও, একবার দেখি।

অতিরিক্ত কাজ পাইবার আশায় তিনি মোটেই বঞ্চিত হইলেন না। অনেকগুলি খাতা ও নথী তাঁহার টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল। রতনমণি বাবু এক মুহূর্ত্তে নথীর ডুবজলে অন্তর্হিত হইলেন। টিফিনের ফাঁকে নিয়মিতভাবে টিফিন সারিয়া আসিলেন। তারপরে আবার কাজ—এইভাবে পাঁচটা পর্য্যন্ত চলিল। পাঁচটা বাজিয়ে চাদর লইয়া রতনমণি বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

রতনমণি বাবুর পেন্সন হইয়াও ছুটি হইল না। তিনি আগেকার মতই নিয়মিত সময়ে আসেন, সেরেস্তাদারের ঘরে বসিয়া বাড়তি কাজ কর্ম্ম করেন, ছুটি হইলে আগেকার মতই বাড়ী চলিয়া যান। সবাই তাঁহাকে বড় পেস্কার বাবু বলে, শ্যামাচরণের নাম হইয়াছে ছোট পেস্কার বাবু। টিফিনের অবকাশে শ্যামাচরণের সঙ্গে দেখা হইলে রতনমণি বাবু তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন—শ্যামাচরণ কোন ভয় নাই, মাথার উপরে আমি। আর ভয়ই বা কিসের? নথী ঠিক থাকলে কেউ কিছু বলতে পারবে না! তবে শোন একটা গল্প বলি,—একবার এক জজ সাহেব এলো মিঃ রঙ্গনাথম্। এদিকে মাদ্রাজী—যেমন রং, তেমনি চেহারা, কিন্তু মেজাজে সাহেবের বাবা! আসছে মেদিনীপুর থেকে, আমি আগেই খবর পেয়েছি; ওখানকার নাজির আমার বন্ধু কি না! সে লিখে পাঠালো—দাদা এবারে বাঘ যাচ্ছে—এখানকার তিনটে পেস্কারের চাকুরি খেয়েছে, সাবধানে থেকো। আমি লিখে পাঠালাম, ভয় ক'রোনা—এখানে বাঘের ঘোগ আছে। জজ সাহেব তো চেষ্টায় আছেন আমার ভুল ধরবেন—হঠাৎ যখন তখন নথী তলব ক'রে বসেন। নাঃ, কোন দিনও কোন খুঁৎ পান না। অবশেষে যাওয়ার সময়ে সাহেব বলে গেলেন—পেস্কার বাবু, আপনার মতো 'এফিসিয়েন্ট অফিসার' এর আগে আমি দেখিনি। তবেই

তো দেখ্‌লে নথী ঠিক থাকলে কারো বাপের সাধ্য নেই কিছু বলে।

এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী বলিয়া অবশেষে গলা খাটো করিয়া শ্যামাচরণের কানে কানে বলেন—আর একটা কথা, বিজয়া দশমীর পরে কাছারী খোলার দিন ছাড়া কখনো হেন 'দর্শনী' নিয়োনা!

রতনমণি বাবু 'ঘুষ' শব্দের পরিবর্ত্তে দর্শনী শব্দ ব্যবহার করেন। শ্যামাচরণ সব মন দিয়া শোনে—নথী ঠিক রাখিতেও তাহার আপত্তি নাই তবে শেষের উপদেশটি সে কি ভাবে পালন করিত সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ না করিলেই তাহার প্রতি সুবিচার করা হইবে।

এই ভাবে দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস অতিবাহিত হয়। বড় পেস্কার বাবু পেন্সন লইয়াও আদালতের কর্ম্মচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া কাজ করেন। কর্ম্মচারীরা অপছন্দ করেনা, একে তো সবাই তাঁহাকে ভালোবাসে, তা ছাড়া হাতের কাজটা তাঁহার কাছে ফেলিয়া দিলে সম্পন্ন হইয়া যায়। সবাই জানে বিজয়া দশমীর পরে বড় পেস্কার বাবুর রুমালে কিছু দিতে হইবে—প্রধানতঃ কর্ম্মচারীরাই দেয়; আগেকার মতো তোড়া তেমন ভারি হয় না। রতনমণি বাবু হাসিয়া বলেন—পেন্সনের মতো দর্শনীও আমার অর্দ্ধেক হ'য়েছে।

আসল কথা, মানুষের জীবন ধারণের জন্যে একটা মোহের আবশ্যক। তাই একটা না একটা মোহের সে সৃষ্টি করিয়া লয়। হাঁসের ডিমের ভিতরকার পাখীর পক্ষে যেমন ডিমের প্রয়োজন, নহিলে কোমল অঙ্গে বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবে কেমন করিয়া? মানুষের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন একটা আবরণের। পাখীটা একটু শক্ত হইলেই খোলস ভাঙিয়া আকাশে উড়িয়া যায় হংসরূপে; ভগ্নমোহ মানুষও তেমনি কৈবল্যের আকাশে পরমহংসরূপে উড়িতে থাকে। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য

কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? অধিকাংশের জীবন ধারণের পক্ষে মোহাবরণ অত্যাবশ্যক। এই বড পেন্সারের ভূমিকা রতনমণি বাবুর মোহাবরণ— ইহার ভঙ্গে হয় তাঁহার মুক্তি নয় তাঁহার মৃত্যু।

রতনমণি বাবুর পেন্সন লইবার পরে প্রায় দশ বৎসর গত হইয়াছে। এখন তিনি প্রায় চলৎশক্তি হীন বৃদ্ধ। তবু তাঁহার আদালতে আসিবার কামাই নাই। একজন চাকরে তাঁহাকে বাড়ী হইতে ধরিয়া আনিয়া পুরাতন চেয়ার খানাতে বসাইয়া দেয়। দৈবাৎ চেয়ার বদল হইলে তিনি ব্যস্ত হইয়া ওঠেন—বলেন, আমার চেয়ারখানা গেল কোথায়। তাঁহার চেয়ার খুঁজিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়—তিনি বসিয়া পড়িয়া চোখ বুঁজিয়া একটা আরামের দীর্ঘ 'আঃ' শব্দ করেন। রতনমণি বাবু প্রায় অন্ধ, চোখে অল্পই দেখেন—হাতে কলম সরে না, তবু এক গাদা নথী তাঁহার সম্মুখে রাখা চাই—তিনি সেগুলি নাড়াচাড়া করেন। এরূপে অভিনয় সাজ হইলে কাছারীর শেষে আবার চাকরের সাহায্যে বাড়ী ফিরিয়া যান। এই রকম চলিতেছে—হয় তো তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিত—কিন্তু ইতিমধ্যে এক বিঘ্ন ঘটিল। সে বিঘ্ন আর কিছুই নয় এক বাঙালী আই-সি-এস-যুবক জজরূপে বদলি হইয়া আসিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আদালতের সেরেস্তা প্রভৃতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কডা তামাকের পাইপ টানিতে টানিতে এঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই জাতীয় পরিদর্শনে রতনমণি বাবুর ভয়ের কোন কারণ ছিল না— কারণ ইতিপূর্ব্বে একাধিক জজ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই, বুড়া মানুষের এই ছেলেমানুষিকে তাহারা স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছেন; একজন ইংরাজ জজ তো তাঁহাকে 'গ্র্যাণ্ড পা অব্ দি কোর্ট' পদবী আখ্যা

দিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ বাঙালী আই সি-এস সেরেস্তাদারের আফিসে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রতনমণি বাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রতনমণি বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সেরেস্তাদারকে ইংরাজিতে পুছিলেন—এই বৃদ্ধ লোকটি কে ?

সেরেস্তদার বলিলেন—আমাদের পুরাতন পেস্কারবাবু।

বাঙালী জজ পাইপ কামড়াইতে কামড়াইতে বলিলেন—লোকটা এখানে কেন ? সেরেস্তাদার বাবু দীর্ঘ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলে মধ্য-পথে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া জজ বলিলেন - লোকটাকে বাহির হইয়া যাইতে বলো।

রতনমণি বাবু যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন—কর্ত্তব্য-পরায়ণ বাঙালী জজ হাঁকিলেন—চিপ্‌রাশি—

চাপরাশি শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল। জজ বলিলেন—বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও। চাপরাশি রতনমণি বাবুর হাতে ধরিয়া আদালতের বাহিরে আসিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। রতনমণি বাবুর চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। অন্ধের চোখে দৃষ্টি নাই—কিন্তু জল আছে। কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া শিষ্‌ দিতে দিতে বাঙালী জজ খাস কামরায় ফিরিয়া গেলেন। কে বলিবে বাঙালী কর্ত্তব্যপরায়ণ নহে ?

বাড়ী ফিরিয়া সেই রাতেই রতনমণি বাবুর বিষম জ্বর হইল—এবং অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর ঘোর বিকারে পরিণত হইল। খবর পাইয়া আদালতের কর্ম্মচারিগণ দেখিতে গেল—কিন্তু চৈতন্যহীন রতনমণি বাবু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। ডাক্তার জবাব দিয়া চলিয়া গেল, বন্ধুরা হতাশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর মুমূর্ষু রতনমণি বাবু বিকারের ঘোরে নথীর নম্বর হাঁকিয়া যাইতে লাগিলেন—

১৭৩।২১ খাজনা

৩৯৩।২৩ মর্টগেজ

২৯১।২৪ মোৎফরাকা...

...চিপরাশি, বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও...

· হুজুর, আমার নথী ঠিক আছে...

· ·না, না, আমি বাইরে যাবো না...

শ্যামাচরণ, নথী ঠিক থাক্‌লে আর কোন ভয় নেই...

· ·চিপরাশি, বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও ··

·· হুজুর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে ··

না না আমি বাইরে যাবো না· ·

১৭৩।২১ খাজনা

৩৯৩।২৩ মর্টগেজ

২৯১।২৪ মোৎফরাকা ··

সবাই বুঝিল আর কোন আশা নাই। তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল—আর মুমূর্ষু পূর্ব্বোক্তরূপ বকিয়া যাইতে থাকিল।

· না, না, হুজুর আমার নথী ঠিক আছে ·

...১৭৩।২১ খাজনা ··

এইরূপ বকিতে বকিতে মুমূর্ষু ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিকারের উক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে ঠিক আদালত ভাঙিবার সময়ে রতনমণি বাবু শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এখানকার আদালতের লীলা তাঁহার শেষ হইল। বোধ করি উচ্চতর কোন আদালতে নথি পেশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্থান করিলেন। প্রকৃতিস্থ মানুষের কথার চেয়ে বিকারের

রুগীর কথাই এ ক্ষেত্রে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য···হুজুর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে। উচ্চতর আদালতে তাঁহার নথীতে কোথাও ভুল-ভ্রান্তি বাহির হইবে না, আর সেখানকার জজ যতই কর্ত্তব্যপরায়ণ হোক এই বৃদ্ধকে চাপরাশি দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিবে না, ইহাও এক-প্রকার নিশ্চিত।

গদাধর পণ্ডিত

১

নরেশচন্দ্র পাটের হাকিম হইয়াছে। জোড়াদীঘি গ্রামে তাহার আফিস। চাকুরিটি পাইয়া তাহার ভরসা হইয়াছিল, কলিকাতায় না হোক কোনো জেলা-সহরে সে থাকিতে পাইবে। কিন্তু এমনি তাহার ভাগ্য যে, জেলা ত দূরে থাকুক, মহকুমাতে থাকাও ঘটিয়া উঠিল না—একেবারে গ্রামে আসিয়া বসিতে হইল। গ্রামে থাকিবার হুকুম পাইয়া তাহার কলিকাতাবাসী মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিল—এমন কি একবার চাকুরি ইস্তফা দিবার কথাও চিন্তা করিয়া ফেলিল, কিন্তু বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের উৎপাতে কোন সৎকার্য্য করিবার কি উপায় আছে? তাহারা বুঝাইল, সরকারী চাকুরি হেলায় হারাইবার বস্তু নয়, বিশেষ করিয়া চিরকালই যে তাহাকে গ্রামে থাকিতে হইবে এমন নয়; চাকুরি পাকা হইলেই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া সহরে ট্রান্সফার হইলেই চলিবে—এমন কত হইয়াছে। তা ছাড়া গ্রামে থাকিবার কতকগুলি সুবিধাও আছে, যেমন অনেক জিনিষ খুব সুলভ; আর অনেক জিনিষ আদৌ মেলে না—কাজেই সে-সব কিনিয়া বৃথা অর্থব্যয় করিতে হয় না। আর গ্রামে সেই একমাত্র সরকারী চাকর, কাজেই অখণ্ড সম্মান ভোগ করিতে পারিবে—সহরে পাটের হাকিমকে চেনে কে? এই সব যুক্তির তাড়নায় আর প্রয়োজনের তাড়াতেও বটে নরেশচন্দ্র জোড়াদীঘিতে গিয়া কাজে যোগ দেওয়া স্থির করিয়া ফেলিল।

ইহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল, যাহা তাহার বন্ধুবান্ধবেরা

জানিত না, কিন্তু পাঠকের জানিতে বাধা নাই নরেশচন্দ্র অল্প বয়স হইতেই আদর্শবাদী। ইস্কুলে পড়িবার সময়ে সে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতাদি শুনিত এবং কাগজে পড়িত। তখন হইতেই সে স্থির করিয়াছিল যে গ্রামে গিয়া দেশের উন্নতি করিবে। কলেজে ঢুকিয়া রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পড়িয়াছে, গান্ধীজীর 'হরিজন' নিয়মিত পড়িত। কাজেই ইস্কুলের আদর্শবাদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু অবশেষে সত্য সত্যই একদিন যে তাহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, তাও আবার পাটের হাকিম হইয়া ইহা স্বপ্নাতীত ছিল। কলিকাতায় থাকিয়া গ্রামের উন্নতি—এই ছিল তাহার স্বপ্ন। হঠাৎ তাহার মনে হইল বিধাতা পুরুষ নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়াই গ্রামে তাহার চাকুরি করিয়া দিয়াছেন—গ্রামের ও নিজের উভয়েরই উন্নতি হইবে—'এক ঢিলে দুই পাখী' প্রবাদের বাহিরেও মরে।

এমন সময়ে সে সহর হইতে তাহার বাল্যবন্ধু অভয়কুমারের এক পত্র পাইল। অভয়কুমার লিখিয়াছে যে, সে আজ কয়েক বৎসর সেখানে ইস্কুলের সাব-ইন্সপেক্টাররূপে রহিয়াছে। সহরের অধীনেই-জোড়াদীঘি গ্রাম; এই পথ ছাড়া জোড়াদীঘিতে যাইবার উপায় নাই। কাজেই নরেশ যেন আগে এখানে আসিয়া তাহার' বাসায় ওঠে—তার পরে জোড়াদীঘিতে যাইতে পারিবে। অভয়কুমারের পত্র পাইয়া নরেশ অনেকটা আশ্বস্ত হইল—তাহা হইলে নিতান্ত সে জলে পড়িবে না। আর অভয় বাল্যকাল হইতেই বাস্তববাদী, সব দিক দিয়াই সে ছিল আদর্শবাদী নরেশের বিপরীত। নরেশ বুঝিল, বিদেশে নির্ভর করিবার মতো একটা লোক পাইবে। সংসারপটুতা বিষয়ে আদর্শবাদীরা বাস্তব-বাদীদের উপর নির্ভর করে, মনে মনে তাহাদের ঈর্ষ্যা করে—ওইখানে বাস্তববাদের জিৎ।

২

জোড়াদীঘিতে আসিয়া নরেশচন্দ্র একেবারে মুষড়িয়া গেল। এতদিন সে সাহিত্যের ত্রিশিরা কাচের ভিতর দিয়া পল্লীকে দেখিত, পল্লী বড়ই মনোরম লাগিত। এবারে প্রথম বাস্তবে পল্লী দেখিল, সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে যাহার কোন মিল নাই। তাহার আরও ধারণা হইয়াছিল, সে যখন পল্লীর প্রতি সহানুভূতি লইয়া আসিতেছে, পল্লীবাসীরা তাহাকে দু'হাত মেলিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটিল না। এই সাহেবী পোষাকধারী ইংরাজি শিক্ষিত বিদেশী যুবককে গ্রামের লোক এড়াইয়া চলিতে লাগিল। দূর হইতে লোকে তাহাকে সেলাম করে কিন্তু তাহার মধ্যে প্রাণের টান নাই, সরকারী চাকুরির মোহ আছে। এমন যে হইবে বন্ধু অভয়কুমার ইঙ্গিতে বলিয়াছিল কিন্তু আদর্শবাদী নরেশ তাহা বিশ্বাস করে নাই।

সে গ্রামের জমিদারের বৈঠকখানা বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছে। জমিদারবাবু কলিকাতায় থাকেন, কাজেই বৈঠকখানায় তাহার একাধিপত্য। কলিকাতায় থাকিতে গ্রামের যে বর্ণনা পাইয়াছিল তাহার কতক অংশ সত্য বলিয়া বুঝিল। খাদ্যবস্তু যে এত সুলভ হইতে পারে সে ধারণা তাহার ছিল না। কাজ তাহার সামান্যই, অধিকাংশ সময় সে বই ও খবরের কাগজ পড়িয়া কাটাইয়া দেয়! গল্পগুজব করিবার বা আড্ডা দিবার মতো লোকের সঙ্গে এখনো তাহার আলাপ হয় নাই।

একদিন সকালে সে বসিয়া আছে এমন সময়ে একটি লোক তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মাথা হইতে একটা ঝুড়ি নামাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। লোকটা বৃদ্ধ, শরীর কৃশ, মাথাভরা টাক, পরণে মলিন একখানা খাটো ধুতি।

লোকটি প্রণিপাত সারিয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—

হুজুরের জন্য কিছু তরকারি এনেছি। নরেশ দেখিল, ঝুড়ির মধ্যে কুমড়ো, লাউ, বেগুন প্রভৃতি আনাজ।

নরেশ বলিল—তা বেশ করেছ, এর দাম কত?

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিল—এ আমার ক্ষেতের তরকারি—দাম আর কি? তা ছাড়া হুজুরের কাছে থেকে কি দাম নিতে পারি?

বিস্মিত নরেশ বুঝিতে পারিল না এই অনুগত লোকটি কে? সে শুধাইল—তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনি না।

বৃদ্ধ বলিল—হুজুরকে আমি খুব চিনি। আপনি মহামান্য ইন্সপেক্টার শ্রীল শ্রীযুক্ত অভয়কুমার রায়ের বন্ধু। হুজুর, আমি এখানকার পাঠশালার হেড পণ্ডিত।

এতক্ষণে নরেশের মনে পড়িল, অভয়কুমার তাহাকে এখানকার পাঠশালার কথা বলিয়াছিল বটে। অভয় তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, পাঠশালার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিও। হেড পণ্ডিত বেজায় ফাঁকিদার। সে আরও বলিয়াছিল, গ্রামের উন্নতি করিবার আশা ছাড়িয়া দাও। ও সব তোমার আমার কর্ম্ম নয়! যদি পাঠশালার পণ্ডিতটাকে একটু শাসনে রাখিতে পার তবেই অনেক করা হইবে। নরেশ শুধাইয়াছিল, পাঠশালার পণ্ডিত তাহাকে মানিবে কেন? অভয় বলিয়াছিল, আরে তুমি যে সাহেবী পোষাক পর তাহাই যথেষ্ট। বিশেষ সে যখন জানিবে যে তুমি আমার বন্ধু, তখন আমার চেয়ে তোমাকে বেশী করিয়া মানিবে। নরেশ দেখিল তাহার কথাই সত্য। সে পাঠশালার সন্ধান লইবার আগেই পাঠশালা তাহার সন্ধান করিয়া লাউ এবং কুমড়ো লইয়া ভেট করিতে আসিয়াছে।

নরেশ বলিল—পণ্ডিত মশাই, এ সব তো আমি নিতে পারি না। এ যে প্রকারান্তরে ঘুষ নেওয়া।

এ রকম কথা পণ্ডিত জীবনে প্রথম শুনিল। সে একেবারে বসিয়া পড়িল। হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর, ঘুষ দেওয়া বেআইনি এ কথা আমি জানি। কিন্তু লাউ কুমড়ো কোন কালেই ঘুষ নয়, বিশেষ সবাই এসব জিনিষ নিয়ে থাকেন।

নরেশ বলিল—কিন্তু এত হাঙ্গামা করবার দরকার ছিল কি? আমার প্রয়োজন অতি সামান্য, আর এসব তো এখানে খুব সস্তা!

পণ্ডিত সপ্রতিভাবে বলিল—সেই জন্যই তো এনেছি হুজুর। দামী জিনিস দেওয়ার মতো কি আমার অবস্থা?

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সহজেই পণ্ডিতের আর্থিক অবস্থার কথা আসিয়া পড়িল। নরেশ বলিল—আপনি বসুন। এই বলিয়া সে একটা মোড়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু পণ্ডিতকে কিছুতেই বসাইতে পারিল না। পণ্ডিত ক্রমাগত বলে—হুজুর আমার অন্নদাতা, পিতৃতুল্য—তাঁহার সম্মুখে কি বসিতে পারি?

নরেশ শুধাইল—পণ্ডিত মশাই, আপনার স্যালারি কত?

এখন 'স্যালারি' কথাটা পণ্ডিত কোন জন্মে শোনে নাই—কি উত্তর দিবে?

নরেশ তাহার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শুধাইল—আপনি পান কত?

পণ্ডিত বলিল—হুজুর, চার টাকা।

চার টাকা! ব্যাপারটা পুরাপুরি বুঝিতে না পারিয়া নরেশ শুধা-ইল—মাসে?

পণ্ডিত বলিল—মাসে আর পাই কই হুজুর? পাঁচ, ছ মাস অন্তর টাকা আসে। এবারে তো এগার-মাস বাকি পড়েছে।

চার টাকা বেতন তার আবার এগার মাস বাকি! নরেশের মাথা

ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল বৈঠকখানার কড়িকাঠ ফাঁক হইয়া তাহার যত সদিচ্ছা ও গ্রামোন্নয়নস্পৃহা সোজা নির্ব্বাণলোকের দিকে প্রস্থান করিল।

নরেশ এবারে পুছিল—তবে আপনার চলে কি ক'রে?

পণ্ডিত বলিল—এই ক্ষেত খামার ক'রে, লাউ-বেগুন লাগিয়ে।

ক্ষেত খামারের কথাটা নরেশের মন্দ লাগিল না, কারণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীকে এই পরামর্শ বহুবার দিয়াছেন। কিন্তু পড়া কখন হয়? তাহার সমাধান তো আচার্য্যদেবের বক্তৃতায় নাই। কাজেই সে পুছিল—ক্ষেত খামার করা মন্দ নয় কিন্তু পাঠশালার কাজে অসুবিধা হয় না?

পণ্ডিত বলিল—পাঠশালার কাজে অসুবিধা! পাঠশালা আছে বলেই তো সুবিধা হয়, ছেলেগুলোকে নিয়ে লেগে যাই।

—তবে পড়ান কখন?

—ওই কাজ করতে করতে। যেমন ধরুন, শশার মাচায় অনেক শশা ফলেছে। আমি বললাম—ওরে, নন্ত দেখত ক'টা শশা। নন্ত গুণে এলো তিন আর চার সাত, আর পাঁচ বারো, আর আট কুড়ি। যোগ শিক্ষা হ'ল। আবার ধরুন, যে দিন শশা তুলতে হবে সেদিন বিয়োগ শিক্ষা হ'ল। কুড়িটা শশার মধ্যে বারোটা তোলা হ'ল—থাকলো আটটা।

দেশজ কিণ্ডারগার্টেনের নমুনা পাইয়া নরেশ কৌতূহলী হইয়া উঠিল। পুছিল—আর গুণ, ভাগ?

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—ততদিন কোন ছাত্রই পাঠশালায় থাকে না। তার অনেক আগেই পাঠশালা ছেড়ে নিজের নিজের ক্ষেত-খামারে লেগে যায়।

—আপনার এই পড়াবার রীতি ইনস্পেক্টর সাহেব জানেন ?

—বিলক্ষণ। সেবারে যখন আমি- শশার ক্ষেতে যোগ শিক্ষা দিচ্ছিলাম, হুজুর হঠাৎ সাইকেল করে এসে উপস্থিত। অমনি বিয়োগ শিক্ষাও দিলাম। তেত্রিশটা শশার মধ্যে তেইশটা তুলে হুজুরকে ভেট দিলাম। হুজুর সে কি খুশি !

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু থামিয়া বলিল—হুজুর একদিন পাঠশালায় পায়ের ধুলো দেবেন।

নরেশ বলিল—অবশ্যই একদিন যাবো। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আপনি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করছেন।

নরেশের কথার সম্যক মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে পণ্ডিত হয়তো কাঁদিয়া ফেলিত, কিন্তু কি যে তাহার কর্ত্তব্য এবং কিভাবে যে সে তাহা অবহেলা করিতেছে বুঝিতে না পারিয়া হুজুরকে পাঠশালা দর্শনের জন্ত বারবার অনুরোধ করিয়া সে প্রস্থান করিল।

পণ্ডিতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া নরেশের মোহ-যবনিকার একপ্রান্ত কিঞ্চিৎ ফাঁক হইয়া গিয়াছিল বটে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার বার বার মনে হইল—লোকটা জাতি গঠন কার্য্যে বিষম অবহেলা করিতেছে, ইহার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু একবারও তাহার মনে হইল না, যে কাজের মাসিক বেতন চার টাকা এবং তাহাও এগার মাস বাকি পড়ে—সে কাজের অবহেলার অভিযোগ একেবারে অচল। তাই কেহ অভিযোগও করে না, মাহিনাও মিটায় না—অনেক দিন হইল একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। শূন্ত উদরের উপর কাহারো দাবী নাই—সে দাবী যতই না কেন মহৎ লোক।

৬

বাজারের কাছে ছোট একখানি চার-চালা ঘরে গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালা বসিয়াছে। চারচালাখানার খড় জীর্ণ, মেঝে কাঁচা, বেড়া ভাঙ্গা। তারই মধ্যে কোন রকমে তিনটা ভাগ। একদিকে চিনি, বাতাসা, গুড় প্রভৃতির ছোট একখানা দোকান। সেখানে গদাধর পণ্ডিত উপবিষ্ট ; হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি, কাঁধের উপরে একখানা গামছা, গলায় মলিন উপবীত, হাতে একখানা ছড়ি। সেই ছড়িখানাই বোধ করি পণ্ডিতের পাঠশালার রাজদণ্ড। কিন্তু সেখানা দিয়া যে কেবল ছাত্র তাড়না চলে এমন মনে করিলে ভুল হইবে ; ছাত্র তাড়নায় অবশ্য সেটা লাগে—কিন্তু এখন দোকানের মাছি তাড়াইবার কাজে নিযুক্ত। গদাধর বসিয়া দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার আবেশে ঢুলিতেছে, আর মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছে—পড়্, পড়্। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ উচ্চারিত—তাহারা, গুটি আট-দশ বালক মাঝখানের ঘরে হুটোপাটি করিতেছে। তৃতীয় ঘরটায় কয়েকটা গোরু বসিয়া রোমন্থন কার্য্যে নিরত। পাঠশালার অদূরে বিখ্যাত সেই শশার মাচা—সেখানে ছাত্ররা যোগ বিয়োগ শিক্ষা পাইয়া থাকে।

একদিন দুপুর বেলা নরেশচন্দ্র পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গদাধর শশব্যস্তে উঠিয়া পাশের দোকান হইতে একটা মোড়া আনিয়া দিয়া বলিল—বসুন হুজুর। তারপর হাত জোড় করিয়া বলিল—একেবারে খবর না দিয়ে—

নরেশ বলিল—ইচ্ছে করেই খবর না দিয়ে এসেছি—কি রকম কাজ চলে দেখবার জন্যে।

তারপর দোকানখানার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি, দোকানও চালান নাকি ?

গদাধর পণ্ডিত বলিল—আজ্ঞে, না চালিয়ে করি কি? ছেলে-মেয়েতে চারটি। বিশেষ, এতে ছেলেদের মণকিয়া, শেরকিয়া শিখবার সাহায্য করে।

—কই, আপনার ছাত্রসব কই?

পণ্ডিত হাঁকিয়া উঠিল—ওরে নন্তু, গদা, রতা, পল্‌ভা—সব কোথায় গেলি? হুজুর এসেছেন যে, সেলাম ক'রে যা।

কিন্তু পণ্ডিতের আদেশ সত্ত্বেও কেহ আসিল না। আসিবে কে? ছাত্রেরা কেহই নাই।

পণ্ডিত বলিল—হুজুর, সবাই ছিল। আপনার সাহেবী পোষাক দেখে সব ভয়ে পালিয়েছে। দূর্, দূর্, দূর্—

শেষোক্ত সাবধান বাণী একটি কুকুরের প্রতি।

নরেশ বলিল—ও ঘরটাতে আবার গোরুও ঢুকিয়েছেন দেখছি।

গদাধর হাসিয়া বলিল—ঠিক তা নয়, আমরাই গরুর ঘরে ঢুকেছি।

তার পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—পুরানো পাঠশালা ঘরখানা ও বছর পুড়ে যায়। সদরে লেখালিখি করে ঘর তুলবার টাকা পাওয়া যায় না। অবশ্য ইন্সপেক্টর সাহেব বলেছেন যে, এজন্যে বারো টাকা দেবেন। কিন্তু ছ' বছর হ'য়ে গেল—টাকা এলো না। কাজ তো চালান চাই। তখন বাজারের দোকানদারদের ধরলাম। তারা এই ঘরখানা তুলে দিল। সর্ত্ত এই হ'ল যে, এর একখানা কামরায় তাদের গোরুগুলো থাকবে। কাজেই হুজুর, এ-ঘরে ওদেরও যে অধিকার, আমাদেরও সেই অধিকার।

পাঠশালার আস্তন্ত স্বচক্ষে দেখিয়া নরেশের কেমন বিভ্রান্তি ঘটিল। যে শিক্ষাসূত্রের একটা দিক সে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছে তাহারই অপর দিকটা যে খড়ের জীর্ণ চারচালায় আসিয়া পর্য্যবসিত—যাহাতে গরু ও মানুষের সমান অধিকার—ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু

কেন জানি না তাহার মনে হইল, ইহার জন্য এই পণ্ডিতই দায়ী, আর কেহ নয়।

গদাধর বলিল—হুজুর ঐ আমার শশার মাচা—ওখানে ছাত্ররা যোগ বিয়োগ শিখে থাকে। একবার দয়া করে পদার্পণ—

নরেশ ক্রুদ্ধভাবে বলিল—না থাক, আর দরকার নেই।

সে পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া বাসায় চলিয়া গেল। বাসায় গিয়া সে অভয়কুমারকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠশালা ও পণ্ডিতের সমস্ত ব্যাপার জানাইল এবং মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, এ সমস্তের জন্যই পণ্ডিত দায়ী। তাহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত না করিলে জাতি-গঠন সম্ভব হইবে না। যেন ওই গদাধর পণ্ডিতই জাতি-গঠনের পথে ঐরাবতের বাধা সৃষ্টি করিয়া দণ্ডায়-মান। যেন ওই একটিমাত্র বাধা অপসৃত হইলেই জাতীয় জীবনের জাহ্নবী ধারা অনর্গল গতিতে প্রবাহিত হইবে। চিঠিখানা লিখিয়া ডাকে দিয়া নরেশ অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল। জাতির প্রতি কর্তব্য যেন তাহার সমাপ্ত হইল।

আট দশ দিন পরের কথা। একদিন বিকাল বেলা নরেশ বেড়াইয়া ফিরিতেছে। গ্রামের এ দিকটায় সে ইতিপূর্ব্বে আসে নাই। একজনকে পুছিল—ওই বাড়ীটি কার?

লোকটা বলিল—ওটা গদাধর পণ্ডিতের বাড়ী।

নরেশের কৌতূহল হইল গদাধর পণ্ডিতের বাড়ীখানা একবার দেখিয়া আসে। সে বাড়ীর কাছে গিয়া দেখিল, বাড়ী তো ভারি। জীর্ণ খান দুই খড়ের ঘর—চারিদিকে আগাছার জঙ্গলে পরিবেষ্টিত। সে দাঁড়াইয়া গদাধর পণ্ডিতের নাম ধরিয়া ডাকিতে সুরু করিল। পাঁচ সাতবার ডাকিবার পরেও কোন উত্তর আসিল না, অথচ ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া লোকের আভাস পাওয়া যাইতেছে। গদাধর পণ্ডিতের গার্হস্থ্য জীবনের

পরিচয় লাভের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সে বেড়া ধাক্কাইতে সুরু করিল। তখন ছোট্ট কাঠের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং ভিতর হইতে গদাধর পণ্ডিত বলিল—হুজুর, বেড়া ধাক্কাবেন না, বেড়া পড়ে যাবে।

নরেশ রুষ্টভাবে কহিল (সে দিনের পর হইতে সে পণ্ডিতের উপর রাগিয়া আছে)—ভিতরে কি করছেন? আসুন না। এতক্ষণ ডাকা-ডাকি করছি—আচ্ছা ভদ্রলোক তো!

পণ্ডিত বলিল—ডাক শুনছি হুজুর, কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই।

অপমানিত বোধ করিয়া নরেশ বলিল—কেন?

গদাধর বলিল—আমরা স্ত্রী-পুরুষে নল-দময়ন্তীর পালা অভিনয় করছি।

নরেশ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল—ঠাট্টা করবার আর লোক পেলেন না?

—সর্ব্বনাশ, হুজুরের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে পারি!

তারপরে সে ঘরের মধ্যে কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল—আঃ, তুমি একটু চুপ করো তো। হুজুরকে বল্‌বো না তো কা'কে বল্‌বো? এবারে হুজুর জানলেন—দেখো এবারে কাপড় মেলে কি না।

এ পর্য্যন্ত বলিয়া সে পুনরায় নরেশকে লক্ষ্য করিয়া সুরু করিল—হুজুর, স্ত্রী-পুরুষে মিলে আমাদের দু'খানা বস্ত্র, দুখানাই ধুতি। একখানা আমি পরি, একখানা আমার সহধর্ম্মিণী পরে। পরতে পরতে যখন খুব ময়লা হয়, তখন কেচে নিতে হয়। রবিবারটা ছুটি—আজ একখানা কেচে শুকোতে দিয়েছি। যতক্ষণ না শুকোচ্ছে আমরা স্ত্রী-পুরুষ এক-খানা ধুতির দুই দিক জড়িয়ে ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকি। এ সেই নল-দময়ন্তীর কথা আর কি? ভাগ্যিস্ পুরাণে এই গল্পটা ছিল—নইলে কি যে করতাম হুজুর। এই বলিয়া সে খুব একটা সপ্রতিভের হাসি হাসিল। নরেশ হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল।

বাসায় আসিয়া একখানা ধুতি চাকরের হাতে দিয়া সে পণ্ডিতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। বাঙ্গালা দেশের লোক সে, দারিদ্র্য দেখিয়াছে, দারিদ্র্যের নগ্নরূপও দেখিয়াছে—কিন্তু নগ্নতা ঢাকিবার এমন পৌরাণিক প্রয়াস যে ঘটিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। হাসির ছটায় দারিদ্র্য যে কি মর্মান্তিক তাহা এই প্রথম সে দেখিল। আজকার ঘটনায় গদাধর পণ্ডিতের সম্যক চেহারা তাহার চোখে পড়িল। এমন হত-দরিদ্রের হাতে যাহারা জাতি-গঠনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে—দোষ সেই জাতির। গদাধর পণ্ডিতকে সমস্ত দায়িত্ব-মুক্ত বলিয়া এবারে তাহার ধারণা হইল। তাহাকে বরখাস্ত করিবার জন্ত চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার আক্ষেপ হইল। স্থির করিল, কালকার ডাকেই অভয়কুমারকে সব ঘটনা লিখিয়া জানাইবে—পণ্ডিতের চাকুরির যেন কোন ক্ষতি না হয়।

এই ঘটনার পরে সে আর কখনো গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালায় বা বাড়ীতে যায় নাই, পণ্ডিতকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। তাহার কাছে নিজেকে অপরাধী বলিয়া তাহার মনে হইত। এমন সময়ে সে একদিন অভয়কুমারের চিঠি পাইল। অভয়কুমার পণ্ডিতের কার্য্যে অবহেলার বিষয়ে তাহার সঙ্গে একমত। সে লিখিয়াছে যে, আমি গদাধর পণ্ডিতকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। শীঘ্রই অন্ত পণ্ডিত যাহাতে ওখানে নিযুক্ত হয় তাহার ত্রুটি করিব না, আর তুমি যে কষ্ট স্বীকার করিয়া এদিকে দৃষ্টি দিয়াছ এজন্ত ধন্তবাদ জানিবে। চিঠিখানা পড়িয়া নরেশ একেবারে বসিয়া পড়িল। তাহার দ্বিতীয় পত্র কি যথাসময়ে পৌঁছায় নাই? গড়িমসি করিয়া চিঠি লিখিতে দু'চার দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। এখন সে গদাধর পণ্ডিতকে কি বলিবে? তাহার জন্তই যে পণ্ডিতের চাকুরী গেল—ইহা তো বুঝিতে বাধিবে না।

এখন উপায় কি? পণ্ডিত অবশ্য কাজকর্ম কিছুই করে না, কিন্তু চার টাকা মাহিনার এগার মাস বাকি পড়িলে কি খাইয়া কাজ করিবে? ছেলেমেয়ে, স্ত্রী-পুরুষে যে তাহারা ছয়টি প্রাণী। আদর্শবাদের ঝোঁকে সে কি করিতে কি করিয়া ফেলিল!

পরদিন সকাল বেলা নরেশ একাকী বসিয়া আছে এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে গদাধর পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। নরেশ পালাইতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু সে পথ ছিল না।

পণ্ডিত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—হুজুর, আমার চাকুরিটা গিয়াছে। এবারে বোধ হয় আমার দুরবস্থা ঘুচবে।

এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। এরকম তৃপ্তির হাসি নরেশ তাহার মুখে আর কখনো দেখে নাই।

পণ্ডিত গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া চলিল—ইচ্ছে থাক্‌লেও চাকুরিটা ছাড়া সম্ভব হয় নি। তিন পুরুষ হ'ল আমরা এই কাজ করছি। সে কি সহজে ছাড়া যায়? অথচ জানতাম, একটু নড়াচড়া করলেই দু'পয়সা বেশি আনতে পারি। এবারে সেই সুযোগ মিল্‌লো।

নরেশ অপরাধীর কণ্ঠে বলিল—তা এ কথা আমাকে জানাবার কারণ কি?

পণ্ডিত বলিল—শুনছিলাম হুজুরের এক জন পাচক ব্রাহ্মণের দরকার। আমি তো ব্রাহ্মণ, ভাবলাম একবার জেনেই আসি—এখন তো আর পাঠশালার হাঙ্গামা নেই।

নরেশ ইহার কি উত্তর দিবে? পণ্ডিতের কথায় তাহার আদর্শবাদের মাথায় 'এটম বোম' নিক্ষিপ্ত হইল। যে-দেশের পাঠশালার পণ্ডিত চাকুরি গেলে খুশি হয়—অপরের পাচকবৃত্তিকে শ্রেয়ঃ মনে করে, মনে

করে এবার তাহার সাংসারিক উন্নতি হইবে—সেদেশের কি আর ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু আছে!

সে তখন পণ্ডিতকে একটা ছুতানাতা করিয়া বিদায় দিল। আর সেই রাত্রেই সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রওনা হইল। কলিকাতায় পৌছাইয়াই চাকুরিতে ইস্তফা পত্র পাঠাইয়া দিল। তারপরে আর কখনো সে দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করে নাই। এখন সে সিভিল সাপ্লাই-এ কাজ করে, বেতন মোটা।

এক গজ মার্কিণ

ও

এক চামচ চিনি

১

মে মাসের দুপুর, বেলা আড়াইটা, কিম্বা তিনটা হওয়াও বিচিত্র নয়। বাহির হইতে হইবে, অনেকক্ষণ আগেই বাহির হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রোদের দিকে তাকাইবামাত্র সমস্ত কর্ম্মস্পৃহা লুপ্ত হইয়া যায়। জরুরি কাজের জন্ত একজনের সঙ্গে বেলা দেড়টায় দেখা করিবার কথা—গড়িমসি করিতে করিতে প্রায় তিনটা বাজিল। আর বিলম্ব নয় ভাবিয়া উঠিয়া পড়িলাম। জামা কাপড়গুলাও আগুনের মতো গরম। কোন মতে একটা জামা গায়ে চাপাইয়া, ছাতা-টা হাতে লইয়া আর একবার চিন্তা করিয়া লইলাম। জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে বাহিরে রৌদ্রের জহরাগ্নির শিখা। রাজপুতরমণীর নিষ্ঠা থাকিলে নিশ্চিন্তমনে এমন অগ্নিসমুদ্রে আত্মসমর্পণ করা যায়—কিন্তু আমি যে নিরীহ বাঙ্গালী ভদ্রলোক। রাজপুতরমণীর সহিষ্ণুতার জন্ত বৃথা আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই ভাবিয়া বাহির হইতে যাইব এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে শুনিলাম—বেরোচ্ছ নাকি? একবার শুনে যেয়ো। আমার সহধর্ম্মিণীর কণ্ঠস্বর।

পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি ধৌত-শীতল মসৃণ মেঝের উপরে, দ্রুত ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক পাখার নীচে, খস্‌খসের সিক্ত সুগন্ধি পর্দ্দা খাটানো জানালার পাশে একটি বালিশ আশ্রয় করিয়া আমার সহধর্ম্মিণী 'সাহারা অতিক্রম' নামে একখানি ভ্রমণ পুস্তক পাঠ করিতেছেন।

পদশব্দে আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া বলিলেন আচ্ছা, সাহারা মরুভূমিতে কি সত্যই এই রকম গরম ?

আমি বলিলাম—তোমার এই ঘরটির চেয়ে কিছু বেশী গরম বই কি ?

আমার নির্বুদ্ধিতায় বিস্মিত হইয়া (আজও তাহার বিস্ময় গেল না) বলিলেন—না গো না, এই কল্‌কাতা সহরের চেয়ে—

বাক্যটি সমাপ্ত হইবার আগেই বলিলাম—বেশি গরম না হ'তেও পারে।

—তবে ওদের এতো বড়াই কিসের—বলিয়া গৃহিণী মুখ খুলিলেন। ভাবিলাম বলি, কলিকাতা সহরে যে কত গরম তাহাতো তোমার বুঝিবার কথা নয়, কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল, গৃহিণীর কাছে সব ভাব প্রকাশ বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

এতক্ষণে তিনি আমাকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—বেরুচ্ছ বুঝি ?

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—তোমাদেরই জীবন সুখের। আমরা চিরকাল ঘরেই বদ্ধ হয়ে রইলাম !

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা নয়, বাড়ীতে এবং সিনেমা, থিয়েটারের ঘরে ! দিবা রাত্রির অনেকটা সময় তিনি বদ্ধ হইয়া থাকেন সত্য। একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেলাম। দীর্ঘনিশ্বাসেরও কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

গৃহিণী বললেন—এক কাজ করো তো। আস্‌বার সময়ে এক গজ মার্কিণ নিয়ে এসো তো।

মার্কিণ ! গৃহিণী কি জাগ্রত না স্বপ্ত ! প্রলাপ নয় তো ? না, কিছুক্ষণ আগে পিতৃ-প্রেরিত মণি-অর্ডার-টি স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছেন, কাজেই প্রলাপ বলি কি করিয়া ? মাথা-টা ঘুরিয়া গেল—আর

একটু হইলেই পড়িয়াছিলাম আর কি? টেবিল-টা আশ্রয় করিয়া কোন মতে রক্ষা পাইলাম।

কি বলি? কনট্রোলের কথা কি গৃহিণী জানেন না? কনট্রোল হইবার পর হইতে চিনি ও কেরোসিন তৈল পাওয়া যায় না বলিয়া অনেক সময়ে তিনি আমাকে গঞ্জনা দিয়াছেন। আর বস্ত্র-কনট্রোলের কথা কি অবগত নহেন?

বলিলাম: মার্কিণ তো পাওয়া যায় না?

—তবে লংক্লথ এনো, বলিয়া তিনি পাতা উল্টাইলেন।

সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—তুমি তো নিয়মিত খবরের কাগজ (অর্থাৎ বিজ্ঞাপন) পড়ো—কাপড় যে পাওয়া যায় না তা কি জানো না?

এবারে 'সাহারা অতিক্রম' রাখিয়া সহধর্ম্মিণী আমাকে লইয়া পড়িলেন—ওই তোমার এক কথা! পাওয়া যায় না! সবাই পায় আর তুমি পাওনা কেন?

আমি বলিলাম—কেউ পায় না।

—খুব পায়। এই বলিয়া তিনি বিশ পঁচিশটি ব্যক্তির নাম করিয়া গেলেন যাহাদের অধিকাংশই এখনো অজাত কিম্বা বহু কাল মৃত। তারপরে একটু থামিয়া ঘুষ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—যায়, যায় পাওয়া যায়. একটু খুঁজে পেতে এনো।

স্ত্রী লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার সহধর্ম্মিণী 'সাহারা অতিক্রম' করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহার জন্য উদ্বেগ বোধ করিতে করিতে কলিকাতার রৌদ্র-সমুদ্রে ডুবুরীর মতো নিমগ্ন হইলাম—একগজ মার্কিণ মুক্তার আশায়।

২

মশাই মার্কিণ আছে ?

অপর পক্ষ নীরব। ইহা আমার সপ্তম দোকান, কেহই কথা বলে নাই, তবু এখনো আশা আছে, রবার্ট ব্রুস নাকি অষ্টম বারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এবারে ভাগ্য অপেক্ষাকৃত প্রসন্নতর, দোকানী কথা বলিল। সে একটা বিড়ি নিজে ধরাইয়া, আর একটা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, নিন ধরান। আমি বিড়ি খাই না, কিন্তু মার্কিণের কিছু সুরাহা হইতে পারে ভাবিয়া তাহাকে খুশী করার আশায় বিড়ি-টি ধরাইলাম। সহৃদয় দোকানী বলিল—মশয়, আপনি ভদ্দরলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানেন বলেই মনে হচ্ছে, কাপড় যে পাওয়া যায় না—তা কি এখনো জানেন না ? আমি অনেকক্ষণ থেকে দেখ্‌ছি আপনি দোকানে দোকানে অনর্থক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ও রকম ক'রে কাজ হয় না।

এই কথায় যেন ক্ষুদ্র একটুখানি আশার আলো দেখিতে পাইলাম—দুস্তর বাধার মধ্যে সূক্ষ্ম জীবন-টানেলের রন্ধ্রপথে একটুখানি আলো। 'ও রকম ক'রে কাজ হয় না।' তবে কাজ হইবার অন্য এক রকম পন্থা নিশ্চয় আছে। তখনি চকিতের মতো সেই অতি পুরাতন অথচ চির নূতন, পরিচয়াতীত অথচ সদা প্রত্যক্ষ, ধনীর সান্ত্বনা আর দরিদ্রের স্বপ্ন, বহুজনকাম্য অথচ স্বল্প জনলভ্য সেই শব্দটি মনে পড়িয়া গেল—'ব্ল্যাক মার্কেট"। এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া বলিয়া ফেলিলাম—ব্ল্যাকমার্কেটে পাওয়া যায় না ?

সে কোন দিকে না তাকাইয়া (আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল) বলিল—পাওয়া যায়। তবে আপনাকে বেচবে কেন ?

—কেন ?

—কেন? ব্ল্যাক মার্কেটের খদ্দের মোটর গাড়ী থেকে নামে, হীরার আংটির ঝলক তুলে রূপোর সিগারেট কেস্ থেকে কৌজি সিগারেট বের ক'রে 'অফার' করে; নিজেই সে অন্ত জিনিষের ব্ল্যাক মার্কেটের বিক্রেতা, সোণার ভাল আর কোথাও জমিয়ে রাখতে সাহস না ক'রে দাঁতগুলো সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে; আপনার মতো পুঁই ডাঁটা খাওয়া-চেহারার ব্ল্যাক-মার্কেট-রহস্তে প্রবেশ নিষেধ!

লোকটা কি অন্তর্যামী নাকি! আমি পুঁই ডাঁটা খাই, লেখা পড়া জানি এবং ভদ্রলোকের ছেলে, এসব গুহ্য তথ্য জানিল কেমন করিয়া?

আমি বলিলাম—মশাই, সব কথাই তো বুঝলাম কিন্তু এখন মার্কিণ না নিয়ে বাড়ী ফিরি কি উপায়ে?

লোকটি হাসিয়া বলিল—ওঃ গিন্নি বুঝি রাগ করবেন?

—নাঃ আর সন্দেহ নাই যে লোকটা অন্তর্যামী। সম্ভবতঃ শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা।

আমি দুঃখে ও সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া বলিলাম—আজ্ঞে ঠিক বলেছেন।

লোকটি বলিল—কোন ভয় নেই। ওষুধ শিখিয়ে দিচ্ছি। কাছে আসুন।

এই বলিয়া গুরু যেমন শিষ্যের কানে ইষ্ট-মন্ত্র প্রদান করে, তেমনি করিয়া তিনি (সে বলিতে আর ইচ্ছা করিতেছে না) কয়েকটি কথা বলিয়া দিলেন। এক মুহূর্তে আমার দ্বিধা দুঃখ দূরীভূত হইয়া নবীন জীবন প্রাপ্ত হইলাম! এতক্ষণ পৃথিবী-টাকে এক খানা ছিন্ন কন্থার মতো বোধ হইতেছিল, এক নিমেষে তাহা বাদশাহী কিংখাবে পরিণত হইল। আমি তাঁহাকে প্রণাম ও নমস্কারের মাঝামাঝি একটা মুদ্রা করিয়া দ্রুতপদে গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম।

বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিলাম এতক্ষণে 'সাহারা অতিক্রম' সমাধা করিয়া গৃহিণী শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আমাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়া বসিলাম—কোথায় গো? শীগ্‌গীর্ শীগ্‌গীর এক কাপ চা নিয়ে এসো। চা দিয়ে তোমার মার্কিণ নিয়ে যাও।

খবরের কাগজে জড়িত একটি পুঁটুলির মতো হাতে ছিল, খবরের কাগজখানা দোকানীর দয়ার দান্।

—কই চা আনো, আর এই মার্কিণ নিয়ে যাও। এর জন্য কি অল্প ঘুরতে হ'য়েছে।

আমার প্রথম সাড়া পাইয়া গৃহিণী নিজের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া দিলেন, এবারে চায়ের তাগিদে একেবারে নীরব। কোন সাড়াশব্দ নাই।

বাস্তবিক দোকানী যে শাপভ্রষ্ট তাহাতে সন্দেহ ছিল না, নতুবা সে কি করিয়া জানিল যে আমার ঘরে চায়ের চিনি নাই—এবং চিনির অভাবে চা না দিতে পারিয়া লজ্জিত গৃহিণী আত্মগোপন করিবেন।

আমি নীচের তলায় বৈঠকখানায় বসিয়া ক্রমাগত হাঁকিতেছি—কই গো, চা আনো আর মার্কিণ নাও। গৃহিণী আর দেখা দেন না। তাঁহার দেখা না পাইয়া এত খুশী আর কখনো হই নাই। তিনিও কি অনুরূপ খুশী হইতেছিলেন!

চা আসিল না, কিন্তু গৃহিণীও আসিলেন না।

গৃহিণী আসিলেন সেই রাত্রে আহারের সময়ে। পুছিলেন—কখন এলে?

—সেই বিকেল বেলা। তোমাকে কত ডাকলাম, কোথায় ছিলে?

তিনি বলিলেন, তুমি বের হবার পরেই আমি ওদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ওরা আমাদের এক প্রতিবেশী।

গৃহিণী মার্কিণের কথা তুলিলেন না দেখিয়া আমিও আর চায়ের কথা তুলিলাম না। আহারান্তে গৃহিণী স্বীকার করিলেন সাহারা গরম কিন্তু কলিকাতা সহরও কম গরম নয়—আমি যেন আর দুপুর বেলা কখনো না বাহির হই—এই অনুরোধটি তিনি করিলেন। আমি সম্মত হইলাম।

সিন্দুক

পাশের ঘরে সদ্য মৃত রামবাবুর দেহটি পড়িয়া আছে আর এ ঘরে তাঁহার চারি পুত্র পিতার সিন্দুকটি জড়াইয়া পড়িয়া আছে, নড়েও না চড়েও না। দৃশ্যটি সময়োচিত নয়, কিন্তু সংসারে সময়োচিত কয়টা ঘটনা ঘটে? রামবাবু বিপত্নীক, কাজেই কাঁদিবার আসল লোকটি ছিল না, আর যাহাদের কাঁদিবার কথা তাহাদের বিষয় তো উল্লেখ করিলাম। শ্মশানে যাইবার সময় অতিক্রান্ত হয় অথচ পুত্রদের সে দিকে দৃষ্টি নাই, অবশেষে পাড়াপ্রতিবেশী উদ্যোগী হইয়া মৃতদেহ সৎকারের জন্য লইয়া গেল—আর পিতৃশোকাতুর পুত্রেরা পৈত্রিক সিন্দুকটি বুকে জড়াইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

বিচক্ষণ পাঠক ইতিমধ্যে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে সিন্দুকটি সামান্য নহে। বাস্তবিক, সিন্দুকটির একটু ইতিহাস আছে, অথবা সিন্দুকটিই ইতিহাস। সেই ইতিহাসই এই কাহিনীর বর্ণনীয়।

রামবাবু গ্রামের মধ্যে ধনী; তাঁহাকে গাঁয়ের লোকে মানে, পাঁচ গাঁয়ের লোক চেনে, দশ গাঁয়ের লোকে ধনীর দৃষ্টান্ত দিতে হইলে এক বাক্যে রামবাবুর উল্লেখ করে। কিন্তু রামবাবুর ধন মূলে কি—নিশ্চয় করিয়া কেহ জানে না। তালুক মুলুক জমিদারী নাই; ক্ষেত খামার জমি জমা যাহা আছে তাহাতে সংসার চলে কিন্তু সংসারে ধনী নাম অর্জন চলে না; ব্যবসা বাণিজ্য রামবাবুর নাই, লগ্নীকারবার বা জোতজমি আছে বলিয়াও কেহ জানে না। এ ছাড়া বাকি থাকিল পৈত্রিক ধন আর গুপ্ত ধন। ও-দুটির বিষয়ে অনুমান চলে, প্রমাণ চলে না। কিন্তু

পরের ধন সম্পর্কে অনুমান যেমন সচল, প্রমাণ তেমনি অচল। কাজেই বিনা প্রমাণে রামবাবুর ধনখ্যাতি ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মতো সকলের বিস্ময় ও বাহবা উদ্রেক করিয়া বিরাজমান; শূন্যোদ্যানের ফুলগুলি এত উচ্চে বিকশিত যে স্বভাবতঃই তাহাকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে রামবাবুর কোন ধন ছিল না তাহা বলা চলে না, তাঁহার মূলধন ঐ সিন্দুকটি।

বাস্তবিক এত বড় সিন্দুক একালে দেখা যায় না, সেকালেও কদাচিৎ দেখা যাইত—এই সিন্দুকের তুলনা দিতে হইলে এক সিন্ধবাদের বিখ্যাত সিন্দুকটি ধরিয়া টান দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক ঘরের আধখানা জুড়িয়া বিরাজ করে। মোটা মোটা লোহার পাত দিয়া আগা গোড়া জড়ানো, ভিতরে পাঁচ সাতটা লোক অনায়াসে গুড়ি মারিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। আর তালাটাই বা কত বড়ো! একটা মানুষের আস্ত মাথার মতো। সিন্দুকের সারা গায়ে সিঁদুর আর চন্দনের দাগ—কত বছরের পুরাতন, কত বিচিত্র রকমের চিহ্ন!

এই সিন্দুকটি যে রামবাবু কি সূত্রে পাইয়াছিলেন লোকে জানে না। খুব সম্ভবতঃ পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত। গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় গ্রামের নদীটি যখন সচল ছিল, সে বহু বছর আগেকার কথা, তখন নদী দিয়া বড় বড় পালোয়ী নৌকা যাতায়াত করিত। তখন নবাবী আমল—একবার ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদগামী একখানি নবাবী বজরা ঝড় উঠিয়া এখানে নদীর বাঁকে ডুবিয়া যায়। সেই নৌকায় নাকি মোহর-ভরা এই সিন্দুক ছিল। রামবাবুর কোনো পূর্ব্বপুরুষ জল হইতে এই সিন্দুকটি উদ্ধার করিয়া বাড়ী লইয়া আসেন। সেই হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত।

অন্যান্য কিংবদন্তীর মতো হয় তো এ ঘটনাও সত্য নয়, বিশেষ রাম-

বাবুর অতীত বা বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু গাঁয়ের লোকে এত তলাইয়া বোঝে না—সিন্দুকটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়? গ্রামের মধ্যে যাহারা সুক্ষ্ম হিসাবী তাহারা সিন্দুকের বর্গফল কষিয়া বহুবার বহু রকমে হিসাব করিয়াছে—মোহর ভর্ত্তি হইলে কত? টাকায় ভর্ত্তি হইলে কত? আর কোম্পানীর কাগজে ঠাসা হইলেই বা কত মূল্য রামবাবুর ঐশ্বর্য্যের! আর এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে সিন্দুকটা শূন্য—তাহা হইলে তো রামবাবুকে ঐন্দ্রজালিক বলিতে হয়—শূন্য সিন্দুকে এরূপ খ্যাতির পূর্ণতা! ঐন্দ্রজালিকেরও মায়া বিস্তারের জন্য একখানা শুষ্ক হাড়ের প্রয়োজন হয়।

রামবাবুর গ্রামের নাম জোড়াদীঘি। জোড়াদীঘিতে একবার পর পর ডাকাতি সুরু হইল। ডাকাত অন্য গ্রামের। জোড়াদীঘির লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাকাতের সঙ্গে পারিয়া উঠিবার উপায় নাই—তাহাদের বন্দুক আছে, ঢাল শড়কি আছে। এ সব না হইলে ডাকাতের দলকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু টাকা কোথায়? তখন গাঁয়ের লোক কাঁদিয়া আসিয়া রামবাবুর পায়ের উপরে পড়িল,—বলিল—কর্ত্তা, আর তো সহ্য হয় না, একবার সিন্দুকটা খুলে কিছু বের করুন, দুশমনদের আমরা দেখে নিই।

রামবাবু সব শুনিয়া, অনেকক্ষণ ভাবিয়া, একটা খড়কে দিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—তা হ'লে সিন্দুক খুলতেই হ'ল দেখ্‌ছি।

গাঁয়ের লোক আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু সিন্দুক খুলিবার আর প্রয়োজন হইল না—যে কারণেই হোক ডাকাতি বন্ধ হইয়া গেল।

গ্রামের লোক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল,—দুশমনরা এবার খবর পেয়েছে যে কর্ত্তা এবারে সিন্দুক খুলবেন। সিন্দুকের নামেই

দুশমনদের এমন ভয় জানিয়া গাঁয়ের লোকে খুব এক চোট হাসিয়া লইল। সিন্দুকের উপরে তাহাদের আস্থা বাড়িয়া গেল।

আর একবারের কথা। বন্যা হইয়া ক্ষেত-খামার ভাসিয়া গেল। লোকে রামবাবুর কাছে আসিয়া বলিল—কর্তা, সিন্দুক না খুল্‌লে তো প্রাণে মরি।

রামবাবু বলিলেন—সে কথা ঠিক। এ রকম ক্ষেত্রে সিন্দুক না খুল্‌লে আর কবে খুলবো।

কিন্তু খুলিবার প্রয়োজন হইল না। দু'একদিনের মধ্যেই চাউল ও বস্ত্র বিতরণের জন্য সদর হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। রামবাবু সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন—না, এরা আমাকে খরচ করতেই দেবে না দেখ্‌ছি।

সকলে বলিল—দুঃখ করবেন না, হুজুর, অসময়ের জন্য আপনার সিন্দুক থাকে। রামবাবু দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন—তোমরা যখন চাইছো, তাই থাক।—সিন্দুকের উপরে সকলের ভক্তি বাড়িয়া গেল।

সিন্দুকটাকে লইয়া রামবাবু কিছু ঘটা করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা স্নান করিয়া গরদের ধুতি চাদর গায়ে সিন্দুকের সম্মুখে বসিয়া পূজার্চ্চনা করিতেন এবং অবশেষে সিন্দুকটাকে ধূপ দীপ লইয়া আরতি করিতেন। অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সিন্দুকটাকে বটের পল্লব দিয়া সাজাইতেন আর বিজয়া দশমীতে সিন্দুকটাকে আগাগোড়া সিন্দুর ও চন্দন দ্বারা আলিম্পিত করিতেন। বাড়ীর চাকরবাকর ও আত্মীয়-পরিজন মুগ্ধবিস্ময়ে কর্তার কাণ্ড দেখিত।

এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে রামবাবুর পুত্রগণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার চারি পুত্র। পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই বুঝিতে পারিল ওই সিন্দুকটাই তাহাদের পরিবারের হৃৎ-পিণ্ড। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই

তাহাদের গতিবিধি সিন্দুকের কাছে ক্রমেই সন্দেহজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। রামবাবু দেখিতে পাইলে বলিতেন—উঁহু, ওদিকে না, যাও পড়ো গে! পুত্রেরা ছুটিয়া পালাইত। তাহারা এক আধবার গোপনে সিন্দুকটা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু লৌহ-আবরণ নির্দয় আর চাবিও অলভ্য। বাস্তবিক তাহার চাবি যে কোথায় তাহা কেহই জানিত না, রামবাবুর সতর্কতা অসীম। নিরুপায় পুত্রেরা ভাবিত—এখন না হোক, একদিন সিন্দুকের রহস্য-উদ্ধার হইবেই পিতার মৃত্যুর পরে।

সেই বহু প্রতীক্ষিত শুভদিন আজ সমাগত। পুত্রগণ সিন্দুক জড়াইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু চাবি কোথায়? কেহই জানে না। কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ খুঁজিতে যাইতে রাজি নয়—কি জানি অপরে কি করিয়া বসে। কাজেই অধিকার সাব্যস্ত করিয়া সিন্দুক জড়াইয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া আর উপায়ন্তর নাই। হয় তো এমনি করিয়া পড়িয়া থাকিয়াই শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রায়োপবেশনে মরিতে হইত, দিনে দিনে, তিলে তিলে। এমন সময়ে গভীর রাত্রে শ্মশানবন্ধুগণ ফিরিয়া আসিয়া প্রকাণ্ড একটা চাবি পুত্রদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিল,—বলিল—কর্ত্তার কোমরে ছিল। পুত্রগণ চাবি লুফিয়া লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়ইল।

তখন সেই গভীর রাত্রে ক্ষীণ দীপালোকমাত্র সহায়ে রামবাবুর চারিপুত্র বহুকালের রহস্য-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইল। তালায় চাবি ঘুরাইতেই খট্ করিয়া শব্দ করিয়া দুর্জ্জয় তালা খুলিয়া গেল। চার জনে মিলিয়া আট হাতের শক্তিতে সিন্দুকের গুরুভার ঢাকনা তুলিল এবং সকলে একসঙ্গে দীপালোক তুলিয়া ভিতরে তাকাইল। সিন্দুক শূন্য! কোথাও কিছু নাই! নাঃ এ তাদের চোখের ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। চারিজন ভিতরে নামিয়া পড়িয়া ডুবারি যেমন করিয়া রত্ন সন্ধান করে

তেমনি করিয়া হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল। সত্যই কোথাও কিছু নাই। এমন সময়ে একখানা কাগজের টুকরা দেখিতে পাইল। চারজনে সেখানা লুব্ধের মতো লইয়া বাহিরে আসিল। ছোট্ট একখানা কাগজের চিরকুট। দীপালোকে দেখিল—তাহাতে পিতার হস্তাক্ষর। চার পুত্র একসঙ্গে চার-কণ্ঠস্বরে তাহা পাঠ করিল। কাগজে রাম বাবুর হস্তাক্ষরে লিখিত—'বাপু সকল, আমার মৃত্যুর পরে সিন্দুক খুলিলেই দেখিতে পাইবে সিন্দুক শূন্য। সিন্দুক যেমন, আমার অদৃষ্টও তেমন—দুইই শূন্য। কিন্তু বুদ্ধি একেবারে শূন্য নয়। দেখনা, শূন্য সিন্দুক লইয়া কেমন আসর জমাইয়া গেলাম। এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও তবে ইচ্ছা করিলে আমার সুনাম ও ধনগৌরব বজায় রাখিতে পারো। তোমাদের কাজ শুধু ধনাপবাদ পরিপাক করা। সব অপবাদের প্রতিবাদ করবে—কেবল ধনাপবাদ ছাড়া। তুমি যে ধনী, অপরের এই বিশ্বাসই প্রকৃত সম্পদ। ইহাকে রক্ষা করিতে সামান্য একটুখানি বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। প্রমাণ—আমার সিন্দুক। তোমরা ধনী—অপরের মনে এই বিশ্বাস আমি স্থাপন করিয়া গেলাম। ইহাই তোমাদের একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তি। এখন ইহাকে রক্ষা করা বা না করা তোমাদের দায়িত্ব। পিতার কর্তব্য আমি পালন করিয়া গেলাম। ইতি নিঃস্ব কিন্তু ধনাপবাদগ্রস্ত পিতা।"

চারিপুত্র পিতার পত্র পড়িয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া নীরবে চুল ছিঁড়িতে লাগিল। কেবল জ্যেষ্ঠের মাথায় সুবৃহৎ টাক বলিয়া সে কনিষ্ঠের চুল ছিঁড়িতে থাকিল। ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম কথা রামবাবুর পত্রে থাকা সত্ত্বেও পুত্রদের মনে পিতার সম্বন্ধে যে-সব অব্যক্তভাব উদিত হইতে লাগিল তাহা প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ—কারণ জগতে এখনো পিতৃভক্ত পুত্রের অভাব ঘটে নাই।

নীলমণির স্বর্গলাভ

১

[সাঁওতাল পরগণায় জয়ন্তী নদীর-ধারে শুয়া পাহাড়ের কোলে কোলে, বাতাস যেখানে মহুয়ার মধু-গন্ধে মদির ·সেখানে ছিল একজনের জন্মভূমি ·কিন্তু সে জানতো না ··তার জ্ঞান যখন হয় সে তখন শহরের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা শৃঙ্খলের শব্দেই তার জীবন গড়ে ওঠে· সব শৃঙ্খলিত জীবের মত তারও হয়ত ধারণা হয়ে যায়, শৃঙ্খল নিয়েই বুঝি সে জন্মেছে··· তার পর একদিন এল বন্যা ভেসে গেল সব···ভেসে গেল সে ·সেই সঙ্গে ভেসে গেল তার শৃঙ্খল···সে জাগলো, যেন নতুন জীবনে, আবার সেই জয়ন্তী নদীর ধারে শুয়া পাহাড়ের কোলে, বাতাস যেখানে মহুয়ার গন্ধে মদির ·জীবনের পর সেই কি স্বর্গ? কিন্তু তবু সে-স্বর্গ-বাসের মধ্যে অন্তরে কিসের যেন বাথা কাঁটার মত ফোটে? কি সে?

ব্যঙ্গসুনিপুণ শিল্পী ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বেদনায় ভরে উঠে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন · এ-প্রশ্ন আর উত্তর নীলমণির জীবনেও যেমন সত্য··· ·আপনার আমার জীবনেও তেমন সত্য···

নীলমণি আর আমাদের মধ্যে যদিও অরণ্যের ব্যবধান কিন্তু কতটুকু এ ব্যবধান?]

'ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্'—নীলমণির বাপ পথ দিয়া ডুগডুগি বাজাইয়া চলিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা ভীড় করিয়া আসে, গ্রামের কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া সাড়া দেয়—কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে না, দূর হইতেই প্রতিবাদ জানায়।

ছেলেদের মধ্যে সাহসীরা আগাইয়া আসিয়া বলে—খেলা দেখাও। নীলমণির বাপ একবার তাহাদের হাতে কিছু আছে কিনা দেখিয়া লইয়া বলে—পয়সা কোথায়? কথাটা ছেলেদের ভালো লাগে না—তাহারা চুপ করিয়া থাকে। নীলমণির বাপ একটু অগ্রসর হইয়া যাইতেই তাহারা ছোট্ট করিয়া একটা ঢিল ছোঁড়ে। নীলমণির বাপ জানিতেও পায় না—কিন্তু নীলমণি মুখ ফিরাইয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া ওঠে, মুখ ঘুরাইয়া হাঁ করে, কয়েকটা দাঁত দেখা যায়। ছেলের দল ভয় পাইয়া পিছাইয়া যায়। কুকুরগুলাকে উৎসাহিত করে—কিন্তু কুকুরগুলা যে ছেলের দলের চেয়ে বেশি সাহসী এমন মনে হয় না, তাহারা ডাকিতে থাকে কিন্তু এগোয় না। ততক্ষণে নীলমণির বাপ অনেক দূরে চলিয়া যায়।

সে অঞ্চলের লোকে নীলমণির বাপের আসল নামটা ভুলিয়া গিয়াছিল—ভালুকটার নাম নীমমণি, তাই ভালুকওয়ালাকে নীলমণির বাপ বলিয়া ডাকিত। নীলমণির বাপ নীলমণিকে লইয়া গ্রামে গ্রামে খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। কাঁধে তাহার ঝুলি, হাতে ডুগডুগি, পিছনে দড়িতে বাঁধা নীলমণি। সে মাথা নিচু করিয়া দড়ির টানে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলে। কিছুক্ষণ পরে পরেই মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ধুঁকিতে থাকে—নীলমণি তখন দড়ি ধরিয়া দাঁড়ায়। ধমক মারিলে সে একবার আচ্ছা করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়—নীলমণির বাপ আবার চলিতে স্থরু করে।

এক একদিন খেলা বেশ জমে, অনেক রোজগার হয়। নীলমণির উপরে তার বাপ সেদিন খুব খুসী। তাকে একটা উইয়ের ঢিপির কাছে ছাড়িয়া দেয়। নীলমণি ঢিবি ভাঙিয়া মাটি খুঁড়িয়া উইয়ের বাসা উজাড় করিয়া খায়। পাখা-ওঠা উইগুলা উড়িয়া যায়—নীলমণি বৃথা আস্ফালন

করে, নীলমণির বাপ কতক কতক ধরিয়া নীলমণির মুখের কাছে ফেলিয়া দেয়। সে দেখিতে দেখিতে সব খাইয়া ফেলে। কিন্তু সবদিন সমান খেলা জোটে না, গাঁয়ের লোক গরীব, প্রতিদিন খেলা দেখিবে কেমন করিয়া। যেদিন সারা দিন ঘুরিয়া কিছু জোটে না, নীলমণির বাপ নীলমণির উপরে রাগ করে। উইয়ের ঢিবি-র পাশ দিয়া গেলেও তাহার উই খাওয়া হয় না। নীলমণি বাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে দড়িতে একটু টান দেয়—নীলমণির বাপ তার চেয়ে জোর টান দিয়া দুইজনে অগ্রসর হইয়া যায়। এই ভালুক আর ভালুকওয়ালা ও অঞ্চলের লোকের অতি পরিচিত।

সাঁওতাল পরগণার জয়ন্তী নদীর ধারে গুয়াপাহাড়ী গ্রামে নীলমণির বাপের বাস। পূজার সময় হইতে সারা শীতকাল তাহার রোজগারের মরশুম। কাছেই ছোট একটা সহর। এই সময়টাতে সহরের শূন্য বাড়ীগুলি স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড়ে ভরিয়া যায়। নীলমণিকে লইয়া লোকটা তখন বেশ দুপয়সা রোজগার করে। ওই কয় মাসের রোজগারে তাহার সারাবছর চলিয়া যায়। নীলমণির বাপকে একেবারে অবিবেচক বলা চলে না—যার জন্যে তার এত রোজগার তাকে খাতির করিয়া চলে। বড় বড় শাদা কড়ির মোটা মালা নীলমণির গলায় পরাইয়া দেয়, মালার মাঝখানে ছোট একটা ঘুন্টি দোলাইয়া দিতেও ভোলে না, আর সাজিমাটি দিয়া তাহার লোমগুলি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া কাঠের কাঁকই দিয়া আঁচড়াইয়া দেয়। নিজের বেশভূষাতেও একটু পারিপাট্য করে। মাথার পাগড়িটা কাচিয়া নূতন করিয়া বাঁধে, হাত-কাটা কালো ফতুয়ার উপরে লাল-নীল পাথরের মালা পরিয়া নেয়। নীলমণির বাপ সাজ বদলাইতে বদলাইতে ভাবে—ভেক না হইলে কি ভিখ মেলে!

২

'ও ভালুক-ওয়ালা এদিকে এসো।' প্রাচিরে ঘেরা বড় বাড়ীটা থেকে এক বাবু ডাক দেয়। নীলমণির বাপ গেট দিয়া ঢুকিতে ঢুকিতে ভাবে বাবু এখানে নূতন, আমার নাম জানেন না। বাস্তবিক তাই। কলিকাতা অঞ্চল হইতে পূজার সময়ে মেদ-বহুল যে-সব ব্যক্তি এখানে স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের জন্ত আসে—এ বাবু তাহাদের অন্ততম।

নীলমণির বাপ প্রবেশ করিয়া একটা সেলাম করিয়া দাঁড়ায়।

বাবু শুধান—খেলা দেখাও, কত নেবে?

সে হাসিয়া বলে—হুজুরের কাছে আর বেশি কি চাইব, পাঁচ সিকে পয়সা দেবেন।

—পাঁচ সিকে—?

অবশেষে এক টাকায় রফা হইলে নীলমণির বাপ ডুগডুগি বাজাইতে সুরু করে—অমনি মহুয়া গাছের তলাটা ছেলেমেয়ে এবং জনতায় ভরিয়া যায়। তখন ভালুকওয়ালা নীলমণির দড়িতে একটা টান দেয়। নীলমণির চমক ভাঙে।

এতক্ষণ সে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিয়া অতি পরিচিত একটা গন্ধ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মহুয়া গাছের গন্ধ। তাহার মনের মধ্যে বসন্তকালের কুয়াশার মতো অস্পষ্ট একটা অনুভূতি জমিয়া উঠিতেছিল—মহুয়া গাছ—মহুয়ার ফুল—নীল পাহাড়ের কাছে ঘন অরণ্য-যার তলা দিয়া প্রবাহিত মহিষাসুরের মুণ্ডের মতো কালো পাথর বাহির হওয়া স্বচ্ছ ধারার নদী। কিন্তু এভাব বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। তাহার কানে প্রবেশ করে—নীলমণি বড় বাবুকে সেলাম করো, এই বলিয়া একখানা লাঠি নীলমণির নখে গুঁজিয়া দেয়। নীলমণি খাড়া

হইয়া উঠিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া মোটা বাবুটিকে উদ্দেশ করিয়া লাঠিখানা মাথায় ঠেকায়। নীলমণি বাবুদের আয়তন বিচার করিয়া বড়বাবু, ছোটবাবু চিনিতে শিখিয়াছে। বড়বাবু খুসী হইয়া একটা সিকি ছুঁড়িয়া দেন, তাহার ইচ্ছা করে সিকিটা কামড়াইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফলে—কিন্তু তখনই মনে পড়ে তাহা হইলে আজ আর উইয়ের ঢিপি খুঁড়িয়া খাওয়ার সুযোগ মিলিবে না।

নীলমণির বাবা আবার বলে—নীলমণি বউ কি করে শ্বশুর বাড়ী যায় দেখাও তো বাবা। রাণী মা শাড়ী দেবেন।

নীলমণি খাড়া হইয়া উঠিয়া ধীরমন্থরগতিতে চলিতে সুরু করে—পিতৃগৃহত্যাগ করিয়া যাইতে বধূর পা যেন চলিতেছেই না।

নীলমণির বাপ হাঁকে—আচ্ছা, নীলমণি এবারে দেখাও তো মেয়ে কি ক'রে বাপের বাড়ী আসে।

নীলমণি অমনি দ্রুতপায়ে তাড়াতাড়ি চলিতে থাকে। দর্শকগণ উচ্চৈস্বরে হাসিয়া ওঠে।

হঠাৎ নীলমণি উপুড় হইয়া পড়িয়া ধুঁকিতে থাকে। সকলে বলিয়া ওঠে ভালুকের জ্বর আসিয়াছে। ছেলেমেয়েরা সাহস পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। বারান্দা হইতে রাণী মা নীলমণির বাপকে বলিয়া পাঠান।—ভালুকের গায়ের কয়েকটা লোম চাই—জ্বরের ধন্বন্তরি ঔষধ। পয়সার লোভে ভালুকওয়ালা নীলমণির লোম টানিয়া ছিঁড়িয়া পাঠাইয়া দেয়।

কিন্তু নীলমণি ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারে না। জ্বর আবার কি? তাহার প্রভুকে মাঝে মাঝে কয়েকদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে, তাহাই কি জ্বর? কিন্তু তাহার হইতে যাইবে কেন? সে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া অতীত জীবনের কথা ভাবিতে থাকে। স্বপ্নের

কুয়াসার মতো অস্পষ্ট অথচ সজীব একসার ছবি তাহার চোখের সমুখ দিয়া ভাসিয়া যায়। এক দিনের কথা মনে পড়ে, সে তখন ছোট, একটা শিয়ালের বাচ্চার চেয়ে বড় হইবে না, মায়ের পিছনে পিছনে যাইতেছিল, এমন সময়ে একটা শিয়ালে তাহাকে তাডা করে। সে নিরুপায় হইয়া মা-কে আহ্বান করিল, মা কয়েক ধাপ আগে ছিল। তারপরে যা কাণ্ড! মা যে এত ছুটিতে পারে—সে কি স্বপ্নেও জানিত! খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া, দাঁত বাহির করিয়া সে কি তাডা! বেচারা শিয়াল বেগতিক দেখিয়া একটা গাছে উঠিয়া পডিল। সেই হইল তাহার কাল। নীলমণির মা সোজা গাছে উঠিয়া শিয়ালটাকে ধরিল—দুটা জডাজডি করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শিয়ালটার ছিন্ন ভিন্ন দেহখণ্ড ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। সে আজ কতদিনের কথা। কোথায় সে বন, মহুয়ার ফুলের নেশায় যাহার সমস্ত মুখ কিংশুক বর্ণে রক্তিম? কোথায় সেই পাহাড়, রাত্রে যেখানে শুকনো ঘাস আগুনে জ্বলে—আর দিনে যেখানে শিমুল আর পলাশে লাল? আর তাহার মনে পড়ে শীতের শেষে বনের মধ্যে ঝরা-পাতার উপর দিয়া সে চলিত, মচ্‌মচ্‌ শব্দ হইত, প্রত্যেক পদক্ষেপেই শঙ্কা হইত পিছনে যেন কে আছে! মুখ ফিরাইয়া দেখিত কেহ নাই, নিজের পায়ের শব্দ বুঝিয়া হাসিত। ভালুকের আবার হাসি? আচ্ছা মানুষগুলা এত নির্বোধ কেন? তাহারা ভাবে হাসি কান্নায় তাহাদের ছাড়া আর কাহারো অধিকার নাই। নির্বোধ ভালুকের মনের কথা বুঝিবে কি প্রকারে? আর নির্বোধ নয় তো কি? নতুবা তাহার চলাফেরা দেখিয়া এত আনন্দ পায় কেন? তাহার প্রভুকে এত পয়সা দেয় কেন? দেয় মন্দ নয়, তাহার প্রভু খুসী হয়, প্রভু খুসী হইলে তাহারও আহার জোটে ভাল। কিন্তু আর নয়। এখনি প্রভু খোঁচা দিবে।

নীলমণির বাপ বলে—ওঠো, বাপ, ওঠো।

নীলমণি গা-ঝাড়া দিয়া ওঠে। সেদিনের মতো খেলা সাঙ্গ করিয়া প্রচুর পয়সা, কাপড় লইয়া নীলমণির বাপ নীলমণিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করে। ছেলেরা কিছুদূর পর্য্যন্ত পিছনে পিছনে আসে—কিন্তু পাড়ার কুকুরগুলো কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িতে চায় না—ঘেউ, ঘেউ, রবে বিরক্ত করিতে থাকে। প্রভু যদি একবার ছাড়িয়া দিত, নীলমণি কুকুর-গুলাকে সেই শিয়ালের অবস্থা করিয়া ছাড়িত।

'ডুগ, ডুগ, ডুগ!' ডুগডুগি বাজাইতে বাজাইতে নীলমণির বাপ নীলমণিকে লইয়া জয়ন্তী নদীর হাঁটু জল পার হইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যায়।

জয়ন্তী নদীর ধারে গুয়াপাহাড়ী গ্রামে নীলমণির বাপের বাস ইহা আগেই বলিয়াছি। গ্রামখানি ছোট। গোয়ালা জাতীয় লোকের বাস। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আতা গাছের সঙ্গে সরু সরু বাঁশের ঝাড়ও আছে। গ্রামের এক পাশে নীলমণির বাপের বাড়ী। মাটির দেয়ালে খড়ের ছাউনি। এক সময়ে তাহার গোটা দুই গোরু ছিল, এখন সেই গোয়াল ঘরে নীলমণি থাকে। নীলমণির বাপ নীলমণিকে লইয়া সফরে বাহির হয়, এক সঙ্গে দশ বারো দিন বাড়ী-ছাড়া থাকে—ফলে তাহার বাড়ী-ঘর ক্রমে হৃতশ্রী হইয়া পড়িতেছে। তাহার আর কেহ নাই।

বাড়ীর নীচেই জয়ন্তী নদী। বালি আর পাথরের একদিকে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের ধারা, কিন্তু হঠাৎ যেদিন বন্যা আসে, কোথা হইতে গেরুয়া জলের অজস্রতা নদী ও নদীর কূল ডুবাইয়া দিয়া গ্রামখানিকে লোপ করিয়া দিতে চায়। নীলমণির বাপের বাড়ীর মধ্যে জল ঢুকিয়া পড়ে,

নীলমণি ঘরের চালে গিয়া আশ্রয় লইয়া শঙ্কিত-চিত্তে জলের প্রলয়-চেষ্টা দেখিতে থাকে। এমনি এক বন্যার মুখে ভাসিতে ভাসিতে সে এই গ্রামে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন সে শিশু। আর কিছু তাহার মনে পড়ে না। তাহার প্রভু তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নিজের বাডীতে রাখে। গলায় ও নাকে দড়ি পরাইয়া দেয়। একটু বড হইলে তাহাকে নানারকম খেলা শিখাইতে আরাম্ভ করে। প্রথম প্রথম সে খুব মার খাইত। এ সব কথা তার বেশ মনে পড়ে। এখন আর মার খাইতে হয় না। সব খেলা শিখিয়া লইয়াছে।

ছুটির দিনে সে বাড়ীর উঠানে বসিয়া থাকে। সমুখে নদী। নদীর ওপারে মাঠ—ক্রমে উঁচু হইয়া দিগন্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে—সেখানে নীল রঙের একটা পাহাড়। মাঠের মধ্যে এখানে ওখানে শাল, খেজুরের বন, দূরে দূরে ছোট গ্রাম—এপার হইতে আকাশের গায়ে প্রলম্বিত চিত্রপটের মতো দেখায়। নীলমণি চুপ করিয়া বসিয়া এই ছবি দেখে আর ওই পাহাডটাকে ভাবে তাহারি মতো একটা কালো ভালুক—কেবল আকার কিছু বডো। ওটারও কি এমনি প্রভু আছে? নিশ্চয়ই আছে। নতুবা কাহার ভয়ে সে একস্থানে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে? আর ওই বনটা? ওখানে হাওয়া যায় না? ওখানে নিশ্চয় মহুয়া গাছের আর অন্ত নাই! নীলমণি ভাবে একবার ওখানে যাইতে পারিলে খুব মজা হয়, আর লোকালয়ে ফিরিবে না। মহুয়া গাছের তলে তলে, শাল বনের ছায়ায় ছায়ায়, ঝরা পাতার উপরে মচ-মচানি শব্দ তুলিয়া সে সারাদিন কেবল উইয়ের ঢিবি খুঁজিয়া বেড়াইবে। আঃ একবার যদি কেবল ছাডা পাওয়া যায়।

নীলমণির বাপ সেদিন যেন কোথায় গিয়াছে। রাত্রেও ফিরিল না। সারারাত্রি অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িল। ফাল্গুন মাসে এমন বৃষ্টি কখনও

হয় না। নীলমণি সমস্ত রাত্রি গোয়ালঘরে বসিয়া বসিয়া ভিজিল। সকাল বেলাতেও বৃষ্টি থামিল না। এমন সময়ে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ উঠিল। বন্যা আসিতেছে। জলের শব্দ আর তার সঙ্গে মানুষের আর্ত্তরব—দুইয়ে মিলিয়া সে এক আতঙ্কজনক কোলাহল। গাঁয়ের লোকেরা যে যাহার গোরু-বাছুর, স্ত্রী-পুত্র লইয়া উঁচু ডাঙার দিকে ছুটিল। নীলমণির কথা কাহারো মনে পড়িল না। তাহার প্রভু বাড়ী-ছাড়া। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রবল বন্যার মুখে নীলমণি ভাসিয়া চলিল। দুই একবার সাঁতার দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শেষে গা ছাড়িয়া দিয়া অনিবার্য্যের স্রোতে ভাসিয়া চলিল—অবশেষে এক সময়ে তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গেল। তারপরে যে কি হইল—নীলমণি আর জানে না।

৪

নীলমণির জ্ঞান হইলে দেখিল সে এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? একি বাস্তব না তাহারি বহুদিনের কল্পনা? ঘনবদ্ধ—শাল, মহুয়া, হরিতকির বনস্পতি। মাটিতে শুক্‌না পাতার সুশ্রাব্য আস্তরণ বিছানো। পাতা-ঝরা শাল গাছের কঙ্কালগুলা সারি সারি দণ্ডায়মান। মহুয়ার গাছে অজস্র শাদা শাদা, গোল গোল, নধর মহুয়ার ফুল, শ্যামল পাতার ফাঁকে ফাঁকে বনদেবীদের নোলকের স্থূল মুক্তার মতো বাতাসে দুলিতেছে। পাশেই ছোট্ট একটুখানি নদী, জলের নীচের মাছগুলার প্রত্যেক গতিবিধি দেখা যায়। ও পারে পলাশে শিমুলে রাঙা। বনের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে—উইয়ের ঢিবির সারি। হরিতকির শাখায় শাখায় মধুর চাক। প্রথমে প্রথমে তাহার ভয় হইত—প্রভু বুঝি এখুনি আসিয়া পড়িবে—কিন্তু সে ভয়ও ক্রমে তাহার কাটিয়া গেল। আর আসিলেই

বা তাহাকে চিনিবে কেমন করিয়া? বন্যার তোড়ে তাহার দড়াদড়ি, গলার মালা সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নীলমণির একবার সন্দেহ হইল সে বাঁচিয়া না মরিয়া আর কোন পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে?

একদিন ঘুম হইতে পরিচিত গন্ধ পাইয়া জাগিয়া উঠিল—দেখে তাহার চারদিকে এক পাল ভালুক—তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গন্ধ শুঁকিয়া তাহার পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতেছে। নীলমণি ভাবিল—ইহারা কি জীবিত না তাহার মতই মরিয়া স্বর্গে আসিয়াছে? সে আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের দলে মিশিয়া চলিতে সুরু করিল।

তাহারা এক হরিতকি বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে অনেকগুলি মৌচাক ছিল। গোটা দুই ভালুক গাছে চড়িয়া কয়েকটা মৌচাক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল। তখন সকলে মিলিয়া সেই-চাকগুলি চুষিয়া খাইল—নীলমণিও একটা খাইল। তারপরে তাহারা মহুয়া গাছের তলে গিয়া ঝরা মহুয়ার ফুল পেট ভরিয়া খাইল। তখন সকলের মাথায় মধুর আর মহুয়ার নেশা চড়িয়াছে। তাহারা বনের মধ্যে মধ্যে বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া নাচিতে সুরু করিল—পায়ের তলাকার শুক্‌নোপাতা নাচের তালে তালে ঝঙ্কার দিতে লাগিল। নীলমণির এবার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস হইল সে মরিয়া স্বর্গে আসিয়াছে—স্বর্গ ছাড়া এত সুখ কোথায়? স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে করিতে এক একবার প্রভুর কথা তাহার মনে পড়িয়া যাইত। প্রভু মরিয়া এখানে আসিলে তাহাকে একবার তাহার ঐশ্বর্য্যটা দেখাইয়া দিত। কিন্তু তখনি আবার মনে পড়িয়া যাইত—প্রভু মরিলে তো এখানে আসিতে পারিবে না—সে মানুষের স্বর্গে যাইবে—এ যে ভালুকের স্বর্গ। নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে পারিবে না বলিয়া তাহার একটু দুঃখ হইত, নাচের তাল কাটিয়া যাইত, আর সকলে বুঝিতে

পারিত না, সে কেন এমন অন্যমনস্ক হইয়া যায়। তাহারা তাহাকে হুঁসিয়ার করিয়া দিত। নীলমণি সচেতন হইয়া উঠিয়া আবার নাচে যোগ দিত। মহুয়া আর মধুর নেশায় তাহার এই একটি মাত্র দুঃখ ডুবিয়া যাইত। শুকনা পাতা ঝঙ্কার দিত, গাছের পাতা বাতাসে সঙ্গত করিত—ওই একটা মাত্র দুঃখকে ডুবাইয়া দিতে এত আয়োজন আবশ্যক। স্বর্গের সুখের পাত্রও কি তবে সত্যসত্যই নিরন্ধ্র নহে!

ভূতপূর্ব্ব

[লেখকের খ্যাতিনাশক একটি একাঙ্ক নাটিকা]

প্রধান চরিত্র

স্বামী

স্ত্রী

ভূতপূর্ব স্বামী

বন্ধু

স্থান—কলিকাতা

কাল—যুদ্ধোত্তর পর্ব

প্রথম দৃশ্য

[একটি ড্রয়িং রুম। খানকতক চেয়ার ও সোফা দিয়া সাজানো। বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কলিকাতার যে কোন রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে খোলা জানালা দিয়া যেমন চোখে পড়ে সেই রকম। দেয়ালের একদিকে একটি ঘড়ি, অন্যদিকে একখানা ছবি—খুব সম্ভবত কাহারো ফটোগ্রাফ কিন্তু নিশ্চয় বুঝিবার উপায় নাই—কারণ ছবি-খানার মুখ দেওয়ালের দিকে—উল্টাপিঠ দৃশ্যমান। ঘরটি শূন্য।]

[বাড়ীর ভিতর হইতে একজন ব্যক্তির প্রবেশ। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ নাট্য ব্যাপারে স্বামী বলিয়া পরিচিত।]

স্বামী—নাঃ, ছবিখানা আবার উল্টিয়ে রাখ্‌লে কে ? এই গোপাল !

গোপাল বা ভৃত্য—বাবু !

স্বামী—ছবিখানা উল্টিয়ে রাখলো কে?

গোপাল—আজ্ঞে, আমি।

স্বামী—তুই রাখতে গেলি কেন? তোকে নিষেধ করিনি। আর কখ্খনো ও ছবিতে তুই হাত দিবি না। বুঝ্লি!

গোপাল—বুঝলাম। তবু ছবি উল্টিয়ে যাবে।

স্বামী—কেমন করে? না ছুঁয়ে তুই ছবি ওল্টাস কেমন করে?

গোপাল—আমি তো ওল্টাই না।

স্বামী—তবে কেন বল্লি যে তুই ছবি উল্টিয়েছিস্?

গোপাল—দোষ হ'লেই মনিবে ধরে নেয় যে চাকরে ক'রেছে—তাই আগে থেকেই স্বীকার করে নিলাম।

স্বামী—তবে ছবি ওল্টালো কে?

[স্ত্রী অর্থাৎ পূর্ণিমার প্রবেশ]

স্ত্রী—ওকে মিছিমিছি ধমকাচ্ছো কেন?

স্বামী—ধমকাবো না? ছবি ওল্টালো কে?

স্ত্রী—আমি।

স্বামী—তুমি! কেন আবার ওল্টাতে গেলে? তোমাকে কতবার নিষেধ করেছি।

স্ত্রী—গোপাল তুই যা।

[গোপালের প্রস্থান।

না উল্টিয়ে করি কি! আমি ও-ছবি দেখতে পারি না।

স্বামী—দেখতে পারো না! কেন? আমার বন্ধুর ছবি, আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল সে—

স্ত্রী—আমার যে—

স্বামী—থাক্, থাক্।

স্ত্রী—তুমি যেমন সে কথা শুনতে চাও না, আমিও তেমনি ও-ছবি দেখ্‌তে পারি না।

স্বামী—আমার বন্ধু বলেই না হয় দেখ্‌লে—

স্ত্রী—তোমরা সব পারো—তোমরা পুরুষ। আমরা মেয়েরা পারি না। অতীতকে যখন আমরা বর্জন করি, নিঃশেষে করি। অতীতের জের বর্তমানের মধ্যে টেনে চলবার শক্তি আমাদের নেই।

স্বামী—সে তো মৃত।

স্ত্রী—থাক্, থাক্, চুপ করো। মানুষ যায় বলে কি স্মৃতিও যায়! ফুল ফেলে দিলেও রুমালে তার গন্ধ থাকে।

স্বামী—সেই গন্ধ বলেই ওই ছবিখানাকে নাও না কেন?

স্ত্রী—তর্ক ক'রে সব বোঝানো যায় না।

স্বামী—তবে কাজেই প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

[ছবিখানা উল্টাইতে প্রবৃত্ত]

স্ত্রী—দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে আমি যাই।

[প্রস্থান।

স্বামী—মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ!

[ছবিখানা সোজামুখে স্থাপন করিতেই সামরিক পোষাক পরিহিত একজন সুপুরুষ যুবকের চেহারা দৃশ্যমান হইল]

ব্রেভ বয়। ডায়েড এ হিরোজ ডেথ্।

[সম্মুখের দ্বার দিয়া এক ব্যক্তির প্রবেশ]

সেই ব্যক্তি অর্থাৎ বন্ধু—কি হে হ্যামলেটের মতো আপন মনে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে কি বক্‌ছ?

স্বামী—বলছি—'লুক এট্ দ্যাট্ পিকচার এণ্ড লুক এট্ দিস্'—

[দিস্ বলিয়া নিজেকে দেখাইল]

বন্ধু—সে তো আমি বল্‌বো তোমাদের দু'জনকে দেখিয়ে—আর পূর্ণিমা শুনবে।

স্বামী—শুনবে? একবার শোনাতে যেয়ো তোমার বান্ধবীকে।

বন্ধু—কেন?

স্বামী—পূর্ণিমা ওই ছবিখানা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। যতবার আমি সোজা করে রাখি, সে উল্টিয়ে দেয়।

বন্ধু—'মরিয়া হবে জয়ী আমার পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি।'

স্বামী—অথচ আমি ওর ছবিখানা ঘর থেকে সরাই কি ক'রে। এমন বন্ধু আর পাবো না।

বন্ধু—সে কথা একশ'বার। বেঁচে থাকতে তোমাকে ভালোবাসতো আর মরবার পরে সর্বস্ব দিয়ে ফেলেছে, বাড়ী ঘর, টাকাকড়ি মায়··

স্বামী—থাক্, থাক্, ওটা আর নাই বল্‌লে। পুরুষোত্তম যখন বর্মা ক্যাম্পেনে যাত্রা করে, আমার ছোট একখানা ছবি চেয়ে নিয়েছিল আর বলেছিল—এ ছবি তোমার বরাবর আমার সঙ্গে থাক্‌বে। জাপানীদের হাতে পড়ি তো এই ছবিসুদ্ধই পড়বো। ওদের বলবো—এ হচ্ছে গিয়ে লর্ড বুদ্ধ'র ছবি। বুদ্ধভক্ত বলে ছেড়ে দিতেও পারে। কিন্তু আর একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা তো এখনও পালন করলো না।

বন্ধু—ও—সেই মৃত্যুর পরে—

স্বামী—হাঁ, মৃত্যুর পরে দেখা দেওয়ার কথা। সে বলেছিল আমার যদি

যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে তোমাকে দেখা দেবো। থিওজফিতে ওর খুব বিশ্বাস ছিল।

বন্ধু—যতো সব বুজরুকি—

স্বামী—না, না। আমি সেদিন ডক্টর দত্তর কাছে গিয়েছিলাম—বাঙলা দেশের সব চেয়ে বড় থিওজফিষ্ট। তিনি সব শুনে বললেন, থিও-জফিতে বিশ্বাসীর মৃত্যুর পরের কথা তো কখনো মিথ্যা হয় না। তার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। আমি মিলিটারী বিভাগের নিজস্ব সংবাদ দেখালাম। তিনি শুনে বল্‌লেন—প্রব্‌লেমটা আমি ভেবে দেখ্‌বো। আজ তাঁর কাছে যাবার কথা আছে। চলো না।

বন্ধু—পূর্ণিমাও কি সঙ্গে যাবে ?

স্বামী- হাঁ, তাকে অনেক ব'লে ক'য়ে রাজি করেছি।

বন্ধু—চলো জীবনে অনেক 'জফি' দেখেছি, এবারে থিওজফি দেখে আসি। কিন্তু ডক্টর দত্তর কথাই সত্যি। থিওজফিষ্টদের মৃত্যুর পরের কথাই মিথ্যা হয় না।

স্বামী—তার মানে ?

বন্ধু—মৃত্যুর আগের কথা সম্বন্ধে তিনি কোন নিশ্চয়তা দেন নি।

স্বামী—তুমি চিরকালই 'সিনিক' থেকে গেলে। এ হচ্ছে বিয়ে না করবার ফল—

বন্ধু—সবাই বিয়ে করলে পরকীয়াসাধনা করবে কে ?

স্বামী—স্বকীয়া থাক্‌লে তবে তো পরকীয়ার মর্ম বোঝা যায়।

বন্ধু—কোন কোন সৌভাগ্যবানের অদৃষ্টে একদেহে পরকীয়া স্বকীয়ার মিলন ঘটে।

স্বামী—আঃ চুপ করো। চলো যাওয়া যাক্‌। পূর্ণিমা ! আমরা আস্‌ছি।

[দুজনের ভিতরের দিকে প্রস্থান।]

[ঘর নির্জন হইল কিন্তু শূন্য হইল না। বিকালের আলো তেরছা-ভাবে জানালা দিয়া আসিয়া মেঝেতে পড়িয়া লোহার শিকের কালো ডোর-টানা আলোছায়ার গেরুয়া বিছাইয়া দিল। ঘড়ির কাঁটা দুটা সুদখোর বৃদ্ধের শীর্ণ আঙুলের মতো প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তটিকে বাজাইয়া লইতে লাগিল। আর নির্জন ঘর নিস্তব্ধ বাদ্যযন্ত্রের নীরবতা লইয়া পড়িয়া রহিল। অন্ধকার আর একটু ঘনাইয়া আসিলে গোপাল ও তাহার সঙ্গে পাশের বাড়ির এক ভৃত্য প্রবেশ করিল।]

গোপাল—নে একটা সিগারেট খা।

রাখাল (পাশের বাড়ীর ভৃত্য)—এ যে দামী জিনিষ।

গোপাল—তুই কি ভাবছিস। বাবুরা কি যে-সে জিনিস খেতে পারে?

রাখাল—তোর বেড়ে চাকরি ভাই।

গোপাল—চাকরি মন্দ নয়, কিন্তু থাকতে ইচ্ছে নেই।

রাখাল—কেন, এমন সুখের চাকরি ছাড়বি কেন?

গোপাল—কি জানি ভাই, কর্ত্তা-গিন্নির ভাব বড ভাল নয়।

রাখাল—কেন?

গোপাল—এই যে ছবিখানা দেখছিস—এই নিয়েই যত গণ্ডগোল। বাবু ছবিখানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে বকে। আবার গিন্নি-মা ছবিখানার দিকে তাকিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়।

রাখাল—ছবি কার?

গোপাল—কি জানি কার? বাবু রাখে সোজা করে। মা দেয় উল্টিয়ে। আর দু'জনেই আমাকে বকে কেন তুই উল্টিয়ে রাখলি, কেন তুই সোজা ক'রে রাখলি।

রাখাল—এ যে মিলিটারি লোক। যুদ্ধে গিয়েছে, বেঁচে আছে না মারা গিয়েছে?

গোপাল—কি জানি! আমি আবার রাত্রে এই ঘরে শুই—ভয় হয় কখন ভূত হ'য়ে এসে চেপে ধরে!

রাখাল—ধরে তো তোর কর্তা-গিন্নিকে ধরবে, চাকর-বাকরকে ধরতে যাবে কেন? ভূতের নজর মানুষের নজরের চেয়ে উঁচু।

গোপাল—না ভাই, দে একটা চাকরি খুঁজে।

রাখাল—চাকরির তো অভাব ছিল না—যুদ্ধ থেমেই যত গোল বাধিয়েছে! যুদ্ধ আর কিছুদিন চল্‌লে ভদ্রলোকগুলোকে একবার দেখে নিতাম।

গোপাল—ওই বুঝি বাবুরা এলো—চল্‌।

[দুইজনের প্রস্থান। বাহিরের দ্বার খুলিয়া দিতে স্বামী, স্ত্রী ও বন্ধুর প্রবেশ।]

স্বামী—কেমন ইম্‌প্রেসড্‌ হয়েছ কি না—ডক্টর দত্তকে দেখে?

বন্ধু—হাঁ, লোকটা ট্যালেণ্টেড্‌ বটে—তাতে সন্দেহ নেই।

স্বামী—ট্যালেণ্টেড্‌! কত বড় স্পিরিচুয়ালিষ্ট দেখ্‌লে না! হিমালয়ের গুহায় যে সব মহাপুরুষ থাকেন, তাঁদের সঙ্গে ওঁর কথাবার্তা চলে।

বন্ধু—প্রমাণ অবশ্য নেই।

স্ত্রী—আবার প্রমাণ কাকে বলে? আপনার সামনেই তো ধ্যানস্থ হলেন—অমনি মুখ দিয়ে কত জ্ঞানের কথা বেরুতে লাগ্‌লো।

বন্ধু—ওকে কি প্রমাণ বলে?

স্ত্রী—শুনলেন না যে মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঁর নিয়ত আলাপ-আলোচনা চলে! কয়েকদিন আগে লর্ড কিচনার এসেছিলেন, তিনি বলে গেলেন—কোন ভয় নেই, মিত্রপক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

স্বামী—অত কথায় কাজ কি? পুরুষোত্তম সম্বন্ধে কি বললেন, এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

স্ত্রী—তিনি বল্‌লেন যে, উনি কাল রাত্রে ওঁকে দেখা দিয়ে বলে গিয়েছেন

যে, উনি 'সেভেন্থ প্লেন'-এ আছেন। আমরা তাঁকে ডাকলেই দেখা দেবেন।

বন্ধু—তারও তো প্রমাণ আবশ্যক।

স্বামী—প্রমাণ তো আমাদের হাতেই। এসো না এই নির্জন ঘরে ব'সে তিনজনে তন্ময় হ'য়ে তার কথা ভাবা যাক্। অবশ্য দেখা দেবে।

বন্ধু—মন্দ কি, দেখাই যাক্ না কি হয়!

[তখন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া খোলা জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া পুরুষোত্তম বা যাহা'র ফটোগ্রাফ তাহার কথা ভাবিতে সুরু করিল।]

স্বামী—উঁহু, চোখ বুঁজতে হবে। একেবারে তন্ময় হ'য়ে যাওয়া চাই—অন্য কথা ভাবলে চলবে না।

[সকলে চোখ বুঁজিয়া নীরব]

স্ত্রী—আমি যেন সেভেন্থ প্লেনের আভাস পাচ্ছি।

স্বামী—ডাক্তার দত্ত সত্যিই বলেছেন যে, মেয়েদের তন্ময় হবার শক্তি বেশী।

বন্ধু—সেভেন্থ প্লেন কি রকম?

স্ত্রী—অনেকটা ছাঁচি কুমড়োর মতো!

[আবার সকলে নীরব]

স্বামী—নাঃ, আমি 'ফিফথ্ প্লেনে'র বেশী কিছুতেই উঠ্‌তে পারছি না।

বন্ধু—সেটা আবার কি রকম?

স্বামী—অনেকটা নালি গুড়ের মতো। তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?

বন্ধু—আমার কেবলি ধোঁকার ডালনার কথা মনে পড়ছে।

স্বামী—ওটা সেকেণ্ড প্লেন!

[আবার সকলের মুদ্রিত চক্ষু নীরবতা]

[হঠাৎ স্ত্রী চোখ খুলিয়া জানালার দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিল]

স্ত্রী—ও কে ? ও কে ?

বন্ধু ও স্বামী—একি ! একি ! বলেছিলাম থিওজফি মিথ্যা হতে পারে না ! এসেছে ! এসেছে !

[জানালার বাহিরে দীপালোকে পুরুষোত্তম দণ্ডায়মান—সামরিক পোষাকে যেমন ছবিতে আছে ।]

স্বামী—কোন্ প্লেনে ছিলে ভাই ?

পুরুষোত্তম—শিঙাপুরে !

স্বামী—না, না, তার পরে ?

পুরুষোত্তম—ওখানেই বরাবর ছিলাম ।

স্বামী—আমরা স্পিরিচুয়্যাল প্লেনের কথা বলছি—অর্থাৎ মৃত্যুর পরে ।

পুরুষোত্তম—(হাসিয়া উঠিয়া) গবর্ণমেণ্ট ভুল খবর দিয়েছিল—আমি মরিনি । পূর্ণিমাকে বিধবার বেশে দেখবো আশঙ্কা করেছিলাম—শাঁখাশাড়ি না ছেড়ে ভালই করেছে ! আগে দরজা খুলে দাও ।

স্ত্রী—মা-গো ! (বলিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল ।)

স্বামী—পুরুষোত্তম তুমি বেঁচে ! কি সর্বনাশ !

বন্ধু—নাঃ, থিওজফি কখনো মিথ্যা হতে পারে না । দেখা মিল্লো শেষ পর্য্যন্ত ।

[বন্ধু উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল—পুরুষোত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—]

পুরুষোত্তম—তিন বৎসর পরে বাড়িতে ফিরলাম—'হোম সুইট হোম ।'

বন্ধু—ইনডীড্ ! সুইটনেস্ অব্ এ সুগার কোটেড পিল !

[সকলে নির্বাক, বিস্মিত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বন্ধুর বাড়ির ড্রয়িং রুম। বন্ধু পুরষোত্তম অর্থাৎ ভূতপূর্ব স্বামী এবং তাহার উকিল]

ভূতপূর্ব স্বামী—আই ওয়াণ্ট মাই ওয়াইফ ব্যাক। দ্যাট ইজ পজিটিভ। আইনের সাহায্যে হয় উত্তম, নতুবা আমি আইন লঙ্ঘন করতে দ্বিধা করবো না। গত তিন বছর ধরে খুন করবার শিক্ষা পেয়েছি, খুন করবার জন্ত উৎসাহ পেয়েছি—এই যে আমার বুকে রঙীন ফিতে দেখছেন, জানেন এ কিসের জন্য? জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ তিনজন জাপানীকে দেখ্‌তে পেলাম। তারা আমাকে দেখতে পাবার আগেই আমি তিনজনকে সাবাড় ক'রে দিলাম। তারই পুরস্কার এই ফিতে। এতদিন পরের রাজ্য ফিরে পাবার জন্তে লড়েছি—এবারে দরকার হ'লে নিজের স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্তে লড়বো।

উকিল—কিন্তু সেটা বে-আইনী।

ভূতপূর্ব—বে-আইনী! শহরে ব'সে আপনারা আইনের এক মূর্তি দেখেছেন। আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে জঙ্গুলে-আইন শিখেছি। সেখানে প্রাণ বাঁচাতে গেলে হত্যা, আশ্রয় নিতে গেলে হত্যা, খাদ্য-সংগ্রহ করতে গেলে হত্যা! সে অভ্যাস কি এত সহজে ভুলতে পারি!

উকিল—কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। আইন-সঙ্গত উপায়েই আপনি আপনার স্ত্রীকে ফিরে পেতে পারেন।

ভূতপূর্ব—আচ্ছা উকিলবাবু, ভারতরক্ষা বিধান প্রয়োগ করা চলে না?

উকিল—সে মকরধ্বজের যে কিসে প্রয়োগ চলে না তা জানি না। কিন্তু অত উৎকট ঔষধের দরকার হবে না। আপনার স্ত্রীর দ্বিতীয়-বিবাহ সিভিল-এ্যাক্ট অনুসারে হ'য়েছে। এখন আপনি ফিরে এসেছেন—এই গ্রাউণ্ডেই পরের বিবাহ বাতিল হ'য়ে যাবে।

ভূতপূর্ব—তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী যদি 'কনটেষ্ট' করে ?

উকিল—মামলা চল্‌বে, কিন্তু আপনি জিতবেন নিশ্চয়।

বন্ধু—কিন্তু স্ত্রী যদি আপত্তি করে ?

উকিল—তাতে ডিভোর্স পেতে বাধা হবে না। অবশ্য এঁর সঙ্গে ঘর-করা না-করা তাঁর ইচ্ছা।

বন্ধু—এ-রকমক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামত একবার নেওয়া দরকার।

ভূতপূর্ব—কেন আমি জাপানীদের হাতে মরলাম না !

বন্ধু—তাতে ঘটনার জটিলতা কমে যেতো, কিন্তু আপনার কোন লাভ হ'ত মনে হয় না।

ভূতপূর্ব—আর এতেই বা আমার কি লাভ হ'ল ?

বন্ধু—ক্ষতিই বা কি হ'ল ? আপনার বাড়ি-ঘর টাকাকড়ি সবই তো ফিরে পেয়েছেন।

ভূতপূর্ব—কিন্তু স্ত্রী ?

উকিল—আর একটি বিয়ে করুন !

বন্ধু—কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তবে আর বিয়ে করবেন না।

ভূতপূর্ব—কেন ?

বন্ধু—এক কলসী জল মাথায় বহন করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘাড়ে ব্যথা ধ'রে যায়—কিন্তু এক সমুদ্র জলে ডুব দিন—কোন ভার নেই। বিবাহ এক কলসী জল; বন্ধুত্ব অগাধ সমুদ্র—তাতে ভার নেই, দায়িত্ব নেই—আছে অবাধ বিহারের মুক্তির আনন্দ।

ভূতপূর্ব—তাই বুঝি আপনি বিবাহ করেন নি ?

বন্ধু—ঠিক ধরেছেন।

ভূতপূর্ব—কিন্তু সমুদ্র আপনাকে চিরকাল বিহারের অধিকার দেবে কেন ?

বন্ধু—এক সমুদ্র না দেয়, আর এক সমুদ্রে চলে যান। জানেন তো সমুদ্র সাতটা, পৃথিবীর বারো আনাই জলময়!

ভূতপূর্ব—আপনার বন্ধুনীরা তো চিরকাল অবিবাহিতা থাকবে না?

বন্ধু—বন্ধুনীর অভাব কি? তাছাড়া, এমন ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব করুন যেখানে আর বিবাহের আশঙ্কা নেই।

ভূতপূর্ব—অর্থাৎ?

বন্ধু—অর্থাৎ পরস্ত্রীকে বন্ধুনী করুন!

ভূতপূর্ব—কিন্তু স্বামী দেবে কেন?

বন্ধু—সব স্বামী দেবে না। কিন্তু অনেক স্বামীকেই এ বিষয়ে পণ্ডিত দেখবেন—তারা বিপদে অর্ধ ত্যাগ করতে অসম্মত নয়। স্ত্রীকে ঘরে রাখবার জন্তে তার সঙ্গসুখ খানিকটা তারা পরিত্যাগ ক'রে থাকে। বিশেষ যখন তার স্ত্রী বন্ধুর সঙ্গে ঘুরছে, সে যে নিষ্ক্রিয় বসে' আছে এমন মনে করবার কারণ নেই, তখন সে অন্ত পরস্ত্রীর সঙ্গ-সুখ ভোগ করছে।

ভূতপূর্ব—অ্যাবসার্ড!

বন্ধু—মোটেই নয়। বর্তমান মেলা-মেশার যুগে সমাজ-ব্যবস্থায় বিবাহকে রক্ষা করবার এই হচ্ছে গিয়ে একমাত্র উপায়। আমাদের সমাজ যখন গ্রামাশ্রয়ী ছিল, বিবাহের একনিষ্ঠা তখনকার বস্তু। এখন নগরাশ্রয়ী সভ্যতা, এখানে অবাধ মেলা-মেশা, ট্রামে, বাসে, ইস্কুলে-কলেজে, খেলার মাঠে, সিনেমা-থিয়েটারে, পথের আর অন্ত নেই। এ-রকম ক্ষেত্রে বিবাহের একটিমাত্র দরজা মানুষের অবাধ চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনের সবটুকু তাতে ভরে না। তাই প্রাচীন সংস্কারের দেয়ালে একটা জানালা ফুটিয়ে দেবার প্রয়োজন হ'য়েছে। সেই জানালাই হচ্ছে বন্ধুত্ব।

ভূতপূর্ব—কিন্তু সতীত্ব?

বন্ধু—জানালা দিয়ে চোখ যায়, কিন্তু দেহ যেতে পারে না।

ভূতপূর্ব—কিন্তু দেহ যদি চোখকে অনুসরণ করতে চায়?

বন্ধু—কেউ কেউ জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করবে—তাই বলে জানালাহীন বাড়ি গড়া চলে না।

ভূতপূর্ব—আপনি বলছেন দেহ-মনের ধর্ম এক নয়?

বন্ধু—আমি বলছি বন্ধুত্ব ও বিবাহের ধর্ম এক নয়। বন্ধুত্বের দেবতা কন্দর্প, বিবাহের দেবতা প্রজাপতি।

ভূতপূর্ব—কিন্তু স্ত্রীরাই বা রাজি হবে কেন?

বন্ধু—সহজে হবে না, একদিনে হবে না। ঘটনার চাপে হবে, ভাব-বিবর্তনের তাড়নায় হবে। সামাজিক সংস্কার তো সমাজরথের চাকার দাগ ছাড়া কিছু নয়। এখন পথ চওড়া হয়েছে, রথ অনেক, সর্বদা নূতন নূতন দাগ প'ড়ছে। প্রফুল্ল সপত্নীদের সখী মনে করতো, আর সূর্যমুখী সপত্নীদের দুঃখে গৃহত্যাগ করেছিল।

ভূতপূর্ব—কিন্তু—

বন্ধু—কিন্তু আবার কি?

ভূতপূর্ব—কিন্তু আমার স্ত্রীকে আমি ফেরৎ চাই।

বন্ধু—যান, তবে হয় মামলা করুন, নয় খুন ক'রে ফাঁসি যান।

ভূতপূর্ব—দরকার হ'লে ফাঁসিই যাবো।

বন্ধু—সেই মরাই মরবেন—তবে যুদ্ধে মরলেন না কেন? যুদ্ধে মরলে "হিরো" হ'তেন—এখানে মরলে খুনে ছাড়া আর কিছু কেউ বলবে না।

ভূতপূর্ব—চলুন উকিলবাবু, পরামর্শ করা যাক্।

উকিল—চলুন।

ভূতপূর্ব—যান, কিন্তু আমার পরামর্শটাও মনে রাখতে চেষ্টা করবেন।

[ভূতপূর্ব ও উকিলের প্রস্থান।]

[স্বামীর প্রবেশ]

স্বামী—স্কাউণ্ড্রেলটা গিয়েছে ?

বন্ধু—যে ছিল তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে হ'ল স্কাউণ্ড্রেল ?

স্বামী—নষ্ট দুধ টক ছাড়া আর কি হয় ?

বন্ধু—তার দোষ কি ? সরকারী খবর সমর্থন ক'রে মরতে পারে নি, এই তো ?

স্বামী—আমারি বা দোষ কি ?

বন্ধু—কেউ তো তোমাকে দোষ দিচ্ছে না।

স্বামী—ওই লোকটা নিশ্চয় দিচ্ছে !

বন্ধু—যার মাথা ঘুরছে, সে পৃথিবীটাকে দোলায়মান দেখবেই। পৃথিবী নড়ছে কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করো যার মাথা ঠিক আছে।

স্বামী—বেশ, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি।

বন্ধু—দোষ কারো নয় ঘটনাচক্রের ছলনা মাত্র। মানুষের গতিবিধির জটিলতা বেড়ে যাচ্ছে—তার ফলে মাঝে মাঝে এমন দু'চারটে অঘটন ঘটবেই। এসব ব্যাপারকে 'এ্যাক্সিডেণ্ট' বলে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

[ভূতপূর্ব স্বামীর প্রবেশ]

ভূতপূর্ব—ছড়িখানা ফেলে গিয়েছিলাম।

[স্বামীকে দেখিয়া]

আই শ্যাল কিল ইউ !

স্বামী—আই শ্যাল স্ম্যাশ ইউ।

ভূতপূর্ব—আই শ্যাল নক ইউ।

স্বামী—আই শ্যাল কিক ইউ।

ভূতপূর্ব—আই শ্যাল সেণ্ড ইউ টু হেল্।

স্বামী—আই শ্যাল.সেণ্ড ইউ টু হেভেন দেয়ার আর নো নিউজ পেপারস্ দেয়ার।

ভূতপূর্ব—আই শ্যাল—আই শ্যাল—

বন্ধু—আশা করি তোমাদের ইংরাজি শব্দের পুঁজি শেষ হ'য়েছে। এখন কি করবে বল। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন জীবের মতো আচরণ করবে, না বর্বরের মতো খুনোখুনি ক'রে মরবে? যদি খুনোখুনি করাই স্থির ক'রে থাকো—তবে এই নাও ·····

[এই বলিয়া সে ভিতর হইতে দু'খান ছোরা আনিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিল।]

নাও। নিচ্ছ না কেন? ও বন্দুক চাই বুঝি, তাও আছে। আনছি।

ভূতপূর্ব—আপনার প্রস্তাব কি?

বন্ধু—দু'জনে শুনতে রাজি হ'লে বল্‌তে পারি।

স্বামী—শুনতে আপত্তি কি?

বন্ধু—আপনাদের কেসটা হচ্ছে—এঁর স্ত্রী স্বামীকে মৃত মনে ক'রে আপনাকে বিয়ে করেছেন। এখন ইনি ফিরে এসেছেন। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? এই তো?

ভূতপূর্ব—এর মধ্যে আবার চিন্তার কি আছে আমি ফিরে এসেছি, আমার জিনিস আমি ফিরে পাবো।

বন্ধু—জিনিস নয়, মানুষ, তার মন আছে।

স্বামী—আমি পেয়েছি, আমি দেবো কেন?

বন্ধু—তোমাকে সে পেয়েছে কি? যদি সে আর তোমাকে না পেতে

চায়? আপনাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে গোরু ভেড়া কিম্বা বিষয়সম্পত্তি নিয়ে যেন আপনারা বিবাদ করছেন। আপনাদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই—যাকে নিয়ে কলহ সে বস্তু নয়, মানুষ, তার মন আছে, তার মতামত আছে।

স্বামী ও ভূতপূর্ব—তারপরে—

বন্ধু—তারপরে তিনি যার সঙ্গে ঘর করতে চাইবেন, তাঁর কাছেই থাক-বেন। আইনের বাধ্য হবেন না। যদি তিনি পুরুষোত্তম বাবুর কাছে থাকতে চান, কোন হাঙ্গামা নেই, তিনি ফিরে আসাতে পরবর্তী বিবাহ বাতিল হ'য়ে গিয়েছে। আর যদি তিনি তোমার সঙ্গে থাকতে চান, তবে আগের বিবাহে একটা ডিভোর্স নিলেই চলবে।

ভূতপূর্ব—হাউ ইজি—

স্বামী—চমৎকার!

বন্ধু—এখন আপনাদের মত কি?

স্বামী ও ভূতপূর্ব—রাজি।

বন্ধু—তবে আগামীকাল এখানেই এই অভিনব স্বয়ংবর অনুষ্ঠিত হবে। এবারে চলুন বেরুনো যাক্! আমি পূর্ণিমাকে নিয়ে একবার ফিরপোতে যাবো।

উভয়ে—আর আমরা?

বন্ধু—আপনারা তো বন্ধু নন, স্বামী মাত্র, অতএব যান সিনেমা টিনেমা দেখে সান্ত্বনা লাভ করতে চেষ্টা করুন।

ভূতপূর্ব—নট ব্যাড!

বন্ধু—স্যর্ ফিলিপ সিডনির অনুকরণে 'দাই নেসেসিটি ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন' বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। চিয়োরো!

স্বামী—চলো মেট্রোতে। একটা ভালো ছবি হচ্ছে দেখে আসি।

ভূতপূর্ব—কি ছবি ?

স্বামী—'হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালি।'

ভূতপূর্ব—চলো।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বন্ধু—আমি তো নিয়ে গিয়েইছি।

[বন্ধুর বাড়ির ড্রয়িং রুম। অপরাহ্ণ। স্বামী ও ভূতপূর্ব স্বামী দুইজনে বসিয়া তাস খেলিতেছে।]

ভূতপূর্ব—নাঃ, আর কতক্ষণ তাস খেলা যায় ! ওরা কখন আসবে ?

স্বামী—কেমন করে বল্‌বো ?

ভূতপূর্ব—দেরি হ'লে একটা খবর দেওয়া উচিত।

স্বামী—তাদের তো তাড়া নেই। তারা বেশ জানে আমরা অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বোই।

ভূতপূর্ব—গিয়েছে কোথায় ?

স্বামী—হয়তো কোন প্রদর্শনীতে, নয় কোন পার্টিতে, নয় কোন সিনেমায় নয় কোন হোটেলে।

ভূতপূর্ব—এমন কি প্রায়ই হয় না কি ?

স্বামী—প্রায়। প্রতিদিন।

ভূতপূর্ব—তবে পূর্ণিমার দেখা পাও কখন্ ?

স্বামী—মানে একবার। যখন তার বন্ধুর হাত থেকে ছাড়া পায়।

ভূতপূর্ব—বাড়িতে নিয়মিত ফেরে তো ?

স্বামী—ফেরে এবং নিয়মিত বটে। তবে প্রতিদিন নূতন নিয়মে।

ভূতপূর্ব—কি রকম ?

স্বামী—ফিরতে প্রায় অনেক রাত হয়ে যায়—বলবার উপায় নেই।

ভূতপূর্ব—কেন ?

স্বামী—কেন কি ? সে বলবে বিয়ে করেছি বলে কি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে নেই ? তুমিও তো তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রো।

ভূতপূর্ব—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এই রকম এসে দাঁড়িয়েছে ? যখন আমরা যুদ্ধে যাই, কই তখন তো এ-রকম ছিল না ?

স্বামী—সে কথা ঠিক। এ যুদ্ধকে বোমার যুদ্ধ বলা হয়েছে। বোমার ঘায়ে কত যুগের পুরাতন বাড়িঘর সব ভেঙে পড়ে নূতন দৃশ্য উদ্ঘাটিত হ'য়ে গিয়েছে। এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যেও তেমনি বোমা-বর্ষণ করেছে, যার ফলে পুরাতন সংস্কারের বাধা সব ভেঙে ভেঙে প'ড়ে নূতন জগৎ অবারিত করে দিয়েছে। যুদ্ধের ফলে রাজ্যে রাজ্যে পুরাতন সম্বন্ধ যে শুধু বদলে গিয়েছে তা নয়, সামাজিক সম্বন্ধেরও পরিবর্তন হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী পিতাপুত্র, ভাইবোন কোন সম্বন্ধই আর আগের ভিত্তিতে অবিচলিত নেই। এরা যাকে বন্ধুত্ব বলছে, তা ভাবী সম্বন্ধের ভূমিকা ছাড়া আর কিছু নয়। বন্ধুত্বের পরিণাম স্বামীত্বেও হ'তে পারে, শত্রুতাতেও হ'তে পারে। ওটা 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড।'

ভূতপূর্ব—কিন্তু পূর্ণিমা তো এমন ছিলো না ?

স্বামী—জাপানই কি এমন ছিল ? জার্মানীই কি এমন ছিল ?

ভূতপূর্ব—রাত্রেও ফিরতে দেরি করে ?

স্বামী—তবে শোনো। একদিন রাত্রে শুতে যাবার সময়েও পূর্ণিমা এলো না। মনের মধ্যে উদ্বেগ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রে যেন স্বপ্ন দেখছি পাশেই পূর্ণিমা শুয়ে আছে—শাদা থানপরা বিধবার বেশ।

ভাবলাম, এ কি ক'রে হয়? আমি তো জীবিত, তবে তার বিধবার বেশ কেন? ঘুম ভেঙে আলো জালিয়ে দেখি পাশেই শাদা পাশ-বালিশটা প'ড়ে আছে। তাকেই পূর্ণিমা মনে ক'রেছিলাম। সে তখনো ফেরেনি।

ভূতপূর্ব—কি বিপদ!

স্বামী—লোকে স্ত্রীলোকের দুঃখ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে—অথচ স্বামীদের দুঃখ যে কত মর্মান্তিক, তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই, বলবার লোক নেই, বলতে গেলে লোকে হেসে উড়িয়ে দেবে। বলবে কাপুরুষ।

ভূতপূর্ব—এসব কথা তো ভাবি নি।

স্বামী—ভাবোনি বলেই তুমি আমাকে দোষী ক'রেছিলে। পূর্ণিমার স্বামীর উপরে তুমি রাগ করতে পারো—কিন্তু পূর্ণিমার বন্ধুদের উপরে তোমার রাগ করবার অধিকার নেই। অথচ রাগ করতে হ'লে ওদের উপরেই করা উচিত, ওদের অধিকারের তুলনায় স্বামীর অধিকার নিতান্ত সঙ্কীর্ণ।

[পাশের ঘরে টেলিফোনের বেল বাজিয়া উঠিল—স্বামী উঠিয়া গেল]

দেখি ব্যাপার কি?

ভূতপূর্ব—কি সর্বনাশ! এমন হ'লে বন্ধুত্ব ছেড়ে বিবাহ করবে কে?

স্বামী—ঠিক বলেছ। যুদ্ধোত্তর যুগের সামাজিক সমাধান হচ্ছে বন্ধুত্ব—স্বামীত্ব নয়।

ভূতপূর্ব—টেলিফোনের খবর কি?

স্বামী—পূর্ণিমার বন্ধু বল্‌ল—যে একটা বিশেষ কারণে ওদের দেরি হয়ে গেল—এখনি আস্‌ছে, আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছে।

ভূতপূর্ব—গিয়েছিল কোথায়?

স্বামী—প্রাচ্য চিত্রকলার প্রদর্শনীতে।

ভূতপূর্ব—যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখছি পায়ের তলাকার পুরাতন মাটিকে কে যেন সরিয়ে নিয়েছে। দাঁড়াতে যাই মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে পড়ি। পুরাতন পথ, পুরাতন জগৎ, পুরাতন সম্বন্ধ, পুরাতন মাটি কিছুই নেই—পুরাতনের ধ্বংসস্তূপে নূতনের পথেও অলঙ্ঘ্য বাধা। এর চেয়ে যে যুদ্ধ চলাই ভালো ছিল। সে এক নেশায় ছিলাম—এত চিন্তা করবার অবকাশ ছিল না। এখন নেশা ছুটেছে, চিন্তা ধরেছে, যে চিন্তার সমাধান নেই। নাঃ, পাগল হ'য়ে যাবো।

স্বামী—পুরুষোত্তম, মানুষে ছয় বছরে ছয়শ' বছর অতিক্রম করে গিয়েছে।

ভূতপূর্ব—কিন্তু কোথায় গিয়েছে? পুরাতন জগতের ধ্বংসস্তূপের তলে চাপাপড়া মানুষের আর্তস্বরে নরকের প্রেতের চোখেও জল আসে।

[বন্ধু ও স্ত্রীর প্রবেশ।]

বন্ধু—এই যে তোমরা অপেক্ষা করছ? বেশ আমি ইচ্ছে ক'রেই পূর্ণিমাকে সঙ্গ-ছাড়া করিনি। আমি নিরপেক্ষ, তোমরা স্বার্থবান তোমাদের একজনের কাছে থাকলে অপরের প্রতি অবিচার করা হ'তো। আমার কাছে থাকতে তোমরা কেউ ওকে ইনফ্লুয়েন্স' করতে পারনি।

স্বামী—এখন তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলো।

বন্ধু—বেশ, পূর্ণিমা, তোমাকে সব বুঝিয়ে বলেছি—এবারে তোমার মতামত স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দাও—কার ঘর করবার ইচ্ছা তোমার?

ভূতপূর্ব—তার আগে আমার একটু বক্তব্য আছে। আমি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে পড়লাম।

বন্ধু ও স্বামী—সরে পড়লে? তুমি? কেন?

ভূতপূর্ব—যার পায়ের তলার মাটি স'রে গিয়েছে সে ঘর গড়বে কোথায়? বন্ধুত্ব ও বিবাহের মধ্যে আমি বন্ধুত্বকেই বেছে নিলাম।

স্বামী—তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না পুরুষোত্তম, তোমার পুরাতন স্বামীত্বে তুমি পুনরধিষ্ঠিত হও—আমিই বরঞ্চ বন্ধু হই।

ভূতপূর্ব—পুরাতন পদে পুনরধিষ্ঠান আর সম্ভব নয়। পুরাতন জগৎও নেই, পুরাতন সম্বন্ধও নেই।

স্বামী—আমি স্বামিত্ব চাই না। আগে বন্ধু ছিলাম, আবার বন্ধু হ'ব।

ভূতপূর্ব—অদৃষ্টের লীলায় আমি স্বামিত্ব থেকে খারিজ হয়েছি—আর স্বামিত্বে ফিরে যাবো না। এবারে বন্ধু হ'ব।

বন্ধু—দেখা যাচ্ছে বন্ধুত্বের গুরুত্ব দু'জনেই উপলব্ধি ক'রেছ?

উভয়ে—করবো না! তাস খেলে বিরহ যাপনশীল স্বামী হওয়ার চেয়ে সিনেমা-থিয়েটার-পার্টি দেখিয়ে বেড়ানো বন্ধু হওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

ভূতপূর্ব—আমি বন্ধু হ'ব।

স্বামী—আমি বন্ধু হ'ব।

বন্ধু—আমি তো হয়েইছি।

ভূতপূর্ব—আমি পার্টিতে নিয়ে যাবো।

স্বামী—আমি নিয়ে যাবো।

বন্ধু—আমি তো নিয়ে গিয়েইছি।

পূর্ণিমা—আমার একটা মতামত নেবার যেন কথা ছিল।

বন্ধু—বেশ তোমার স্বাধীন মত দাও, কে স্বামী হবে আর কে বন্ধু?

পূর্ণিমা—আমি পুরাতন আশ্রয়ে ফিরে যেতে চাই।

ভূতপূর্ব—হা হতোঽস্মি। কেন জাপানীদের হাতে মরলাম না। তোমার মনে শেষে এই ছিল।

স্বামী—এবারে আমি হলাম ভূতপূর্ব স্বামী। পূর্ণিমা তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

স্ত্রী—তোমাকে নয়, আপনাকে।

স্বামী—আপনাকে, আপনাকে, একশবার আপনাকে।

ভূতপূর্ব—চলো তা'হলে বাড়িতে যাওয়া যাক।

স্ত্রী—কিন্তু আজ যে আমার একটা পার্টি ছিল।

ভূতপূর্ব—চলো আমিও যাই।

স্ত্রী—সেখানে স্বামীর প্রবেশ নিষেধ, বন্ধু যেতে পারে।

স্বামী—চলো—চলুন আমি যাচ্ছি।

স্ত্রী—চলুন!

স্বামী—এবারে তুমি কি করবে? আমি তো পূর্ণিমাকে নিয়ে চল্‌লাম।

ভূতপূর্ব—'ওথেলোজ অকুপেশনস গন।"

বন্ধু—তার চেয়ে শুনুন—

"আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।"

পত্নীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ হতে পারে—বন্ধু অসংখ্য। আমি চললাম মিঃ মুখার্জির বাড়িতে। মিসেস মুখার্জিকে নিয়ে যাবো সিনেমায়—

স্বামী—কি ছবি?

বন্ধু—'প্র্যাকটিক্যালি ইওরস্'।

স্ত্রী—'আই এনভি হার।'

স্বামী—চলুন পূর্ণিমা দেবী। চিয়োরো বয়।

স্ত্রী—তুমি বাড়িটা গুছিয়ে রাখো গিয়ে আমি আসছি। 'টাটা'।

[দুজনের প্রস্থান।]

ভূতপূর্ব—জাপানীর হাতে মরবার সৌভাগ্য যার হয়নি—তার কি স্বামীত্ব এড়াবার সৌভাগ্য হবে? যাই বাড়ি গোছাই গে।

বন্ধু—দুঃখ করবেন না। মিসেস গুপ্তর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। বন্ধু হিসাবে তিনি আইডিয়াল হবেন।

ভূতপূর্ব—আজই, এখনই চলুন।

বন্ধু—চলুন।

ভূতপূর্ব—'থ্যাঙ্ক গড—আই অ্যাম্ সেভ্ড।'

[দু'জনের প্রস্থান।]